ছায়া আছে কায়া নেই

অন্যজগতের অতিথিদের অব্যক্ত কথা

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ছায়া আছে কায়া নেই

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ছায়া আছে

কায়া নেই



সাধনা

সাধনা

এক পত্রভারতী উদ্যোগ
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২০

অন্বেষা চ্যাটার্জি কর্তৃক সাধনা, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দীপাঞ্জন বসু

বিক্রয়কেন্দ্র পত্রভারতী। ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CHAYA ACHE KAYA NEI
by Apurba Chattopadhyay
Published by SADHANA BHARATI, 1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700 009
Phones 23501944, 94330 75550, 98308 06799
E-mail sadhanabharati2019@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-946555-0-3

আমার পূজা, অন্বেষা ও
শুদ্ধা চট্টোপাধ্যায়কে

লেখকের পত্রভারতী প্রকাশিত বই

গুণীজনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা
ত্রৈলঙ্গস্বামী সমগ্র
বাঘবন্দি খেলা
ছায়া আছে কায়া নেই

মুখপাত

অতীত যখন মনে পড়ে তখন সেটা স্মরণ, আর যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন পুরনোকে নতুন করে পেয়ে আমরা আদর করে ডাকি 'ভূত'! ভূতকে বাদ দিয়ে বর্তমান হয় না। বর্তমান হল ছায়া কায়ার আসন। সামান্য স্পন্দনে সেখানে কায়া ছায়া হয়, ছায়া হয় কায়া। একে অপরের পরিপূরক। প্রকাশকও। নৈকট্যেও ছায়া থাকে, তবে সেটা দূরে দীর্ঘতর। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না—এই থাকার মধ্যে না থাকা এবং না থাকার মধ্যে থাকার যে প্রবল আকর্ষণ ও আত্মীয়তা, এই গ্রন্থে তাকে নৈপুণ্যের সঙ্গে নাড়াচাড়া করেছেন অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়।

অপূর্ব তাই 'ভূত' বলেননি। বলেছেন 'ছায়া'। 'তাঁদের' কথা বলতে গেলেই অতীত আসে। অপূর্ব তাঁকে সম্মান করেছেন। তাঁর এই ভূতপূর্ব ভূতচর্চাটি অভূতপূর্ব হয়েছে। আসা যাওয়ার পথে ক্ষণিকের জন্য আমাদের যেন 'আছি' এবং 'আছে' নিয়ে চলাচলির খেলা! সেই খেলায় থাকতে থাকতে বেশ 'নেই' হয়ে যায় সব কিছু। তারপর কী? এ প্রশ্ন প্রাচীন।

কিন্তু পুরোনো হাত, চেনা হাত ছাড়তে ইচ্ছে করে না-তাই আমরা পিছু ডাকি মনে মনে! ডাকলে ভগবানও সাড়া দেন, তো ভূত কোন ছার! অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই সংলাপসূত্রে এক নতুন জগতের খোঁজ খবর পাওয়া হয়। অপূর্বর ভূতেরা ভুশুণ্ডির মাঠের বাসিন্দা নন। তাঁরা সব ডাকসাইটে ব্যক্তি। যাঁদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হচ্ছে বা কথা হচ্ছে তাঁরাও বেশ বিখ্যাত। এই রচনার ভারসাম্য এখানেই।

পুরোনো কলকাতার সন্ধ্যা, মাঝরাত, শেষরাতের চিত্রকল্পের সঙ্গে বুড়ো বাড়ি আর পিতামহ বনস্পতি— যারা যাই যাই করেও এখনও থেকে গেছে, তাদের আশ্রয়েই তেনাদের বিস্তার। অপূর্ব ভূতচর্চার দলিল লেখেননি, উপহার দিয়েছেন মানুষের এবং সভ্যতার ইতিহাসের একটি অনিবার্য অঙ্গ।

কৌতূহল, ভালোবাসা আর অন্তরের টানে জীবিত ও মৃতের মধ্যে যে ক্ষণিকের পাগল করা পরশ রয়েছে —লেখক সে বার্তাটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখনী শক্তিশালী ও রসসমৃদ্ধ। তিনি সিদ্ধ পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁর নিজস্ব মননের সঙ্গেও আমরা দীর্ঘদিন পরিচিত আছি। এই লেখাটি আগেই 'বর্তমান' প্রত্রিকার 'রবিবার'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। পরিমার্জিত হয়ে এখন সেটাই গ্রন্থরূপ পেল। কায়া-র ছায়াসঙ্গের এই সুযোগ পাঠককুল ছাড়বেন না, এই বিশ্বাস আমার আছে।

লোকনাথ চক্রবর্তী

আগস্ট ২০২০
কলকাতা

শুরুর আগে

বছর দুয়েক আগের কথা। হঠাৎই বাড়ির লাইব্রেরি পরিষ্কার করতে গিয়ে খুঁজে পেলাম 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের একটি বিশেষ খণ্ড। লেখক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সেই খণ্ডটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর অকালপ্রয়াত পুত্র শ্রীপয়সকান্তি ঘোষকে। লেখক ওই গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট করে লিখেছিলেন সেই অলৌকিক ঘটনাটির কথা।

প্রেতচর্চা বা প্রেত-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বাঙালির আগ্রহ যে একটু বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ আমাদের মননের দেবতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিয়মিত প্ল্যানচেট করতেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য 'লোক' থেকে বারে-বারে ছুটে এসেছেন তাঁর অকালে হারিয়ে যাওয়া অত্যন্ত প্রিয়জনেরা।

শুধু তিনি কেন? সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীরাও তাঁদের দর্শন পেয়েছেন, কথাও বলেছেন।

বিষয়টা বেশ আকর্ষণ করল, শুরু করলাম লেখা। দীর্ঘ ন'মাসের কিছু বেশি সময় ধরে বর্তমান রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত হয় 'ছায়া আছে কায়া নেই' ধারাবাহিকটি। এবার সেটি গ্রন্থিত হল পুস্তকাকারে।

এই ধারাবাহিকটি লিখতে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, বন্ধুবর জয়ন্ত দে, অয়নকুমার দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, অন্বেষা চট্টোপাধ্যায় এবং পূজা ও শুদ্ধা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ভূত আর প্রেত শব্দ দুটি নিম্নমার্গের, লোকমুখে ব্যবহৃত হতে হতে অবাস্তব ও অসম্মানের হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ দেহত্যাগের পর তাঁর অস্তিত্ব ভিন্ন একটি লোকে প্রয়াত হয়। একটি তরঙ্গের আকারে মহাবিশ্বে, মহাকাশে বিচরণ করে। এটি একটি 'ওয়েভ'।

আমরা এই ওয়েভ শব্দটির সঙ্গে ইদানীং পরিচিত হতে পেরেছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি তরঙ্গের জালে জড়িয়ে আছে। এই গ্রন্থটিতে যে বিষয় নিয়ে কাহিনীর আকারে আলোচনা করা হয়েছে সে গুলি ভূত-প্রেতের ব্যাপার নয়, একটি মিডিয়ামের মাধ্যমে সেই তরঙ্গকে ধরা যায়। অতীতে বহু বিখ্যাত মানুষ চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন প্ল্যানচেট। এই গ্রন্থটি সাধারণ ভূত-প্রেতের গল্প নয়, অন্তহীন অস্তিত্বের বিবরণী।

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বরানগর, কলকাতা
৩ আগস্ট ২০২০



আজ থেকে বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও 'তাঁদের' রমরমা উপস্থিতির কথা অনেক মানুষজনই বেশ বুঝতে পারতেন। সেইসময় কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু পরিত্যক্ত, পুরোনো বাড়ি ছিল। সেইসব বাড়ির বিভিন্ন তলায় তাঁরা সপরিবারে বসবাস করতেন। দিনের বেলায় তাঁদের চলাফেরা মোটেই টের পাওয়া যেত না। যেই সূর্যদেব সেদিনের মতো পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তেন, তখনই হাতে আঁকশি নিয়ে এক সাইকেল আরোহী টুক টুক করে একের পর এক ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বালাতে জ্বালাতে হারিয়ে যেতেন এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়। হলদে হয়ে যাওয়া সেই বালবের ম্রিয়মাণ আলো কিন্তু আজকের মতো কোনওদিনই রাস্তা ছুঁতে পারত না। আর তারপরেই শুরু হত তাঁদের হই-হুল্লোড়। কিছু কিছু এলাকার পুরো দখলদারি তাঁরা নিয়ে নিতেন। যেমন বরাহনগর কুটিঘাট অঞ্চলের বসাকবাগানের দীর্ঘ পথটি রাতের বেলায় পার হতে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে উঠত। একদিকে বিশাল এক কেয়া ঝোপ, আর রাস্তার ধারে বসাকদেরই কোনও পূর্বপুরুষ সার দিয়ে ছোট ছোট এক ধরনের ফলের গাছ পুঁতেছিলেন। অদ্ভুত আকৃতির সেই গাছে সবজে রঙের পাকানো অসাধারণ ফল ফলত। ওপরের মোটা সবুজ খোসাটা ছাড়িয়ে ফেললেই বেরিয়ে আসত সাদা শাঁস। অদ্ভুত তার স্বাদ। তাকে আমরা আদর করে জিলিপি ফল বলে ডাকতাম। তবে এই বাগানের সেই কুখ্যাত গাবগাছটিই ছিল মানুষের ত্রাসের কারণ। কারণ, ওই গাবগাছে প্রতিবছরই কেউ না কেউ গলায় দড়ি দিতেন। ফাঁসি-ঝোলা গাবগাছ নামে সে বিখ্যাত ছিল। অনেকেই এই গাছের তলায় রাত-গভীরে তাঁদের দর্শন পেয়েছেন বলেও শোনা যেত। বর্তমানে সেই গাবগাছ অতীতের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এই রাস্তার শেষ মাথার একটি বাড়িও যথেষ্ট কুখ্যাত ছিল। বালিগঞ্জের এক ধনী

ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল সেটি। রাতের দিকে বহু মানুষই সেই বাড়ি থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পেতেন।

এইরকমই একটি রাস্তা হল রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রিট। কুটিঘাট রোডের বুক থেকে উঠে মা গঙ্গার গা ঘেঁষে অধুনা লুপ্ত সতীদাহ ঘাট ছুঁয়ে সে এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে প্রামাণিক ঘাট রোডে। এখানেই রয়েছে সেই বিখ্যাত কাঁথাধারী মঠ। বহুকাল আগে সপার্ষদ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে পুরী যাচ্ছিলেন। তাঁরা গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি চালা দেখে সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন বলে ঠিক করেন। ওই চালাটি ছিল এক ব্রাহ্মণ ভক্তের। গৃহকর্তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে মহাপ্রভু বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গের কাঁথাটি ব্রাহ্মণের গায়ে জড়িয়ে দেন। সেই কাঁথা আজও রয়েছে বর্তমান মঠে। এই মঠ পেরিয়ে একটু এগোলেই বাঁদিকের সেই ঘাটটি আজও বহু অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটটির নাম শিলাঘাট। নকশাল আন্দোলনের শেষক্ষণে একদিন, যেদিনটি আজও কলঙ্কিত হয়ে আছে 'বরাহনগর কিলিং' নামে, ওই ঘাটেই খুন করা হয়েছিল অসংখ্য তরুণকে। তারপর তাঁদের ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়। তাই রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রিটের ওই অংশটি সম্পর্কে বহু মানুষ নানারকম কথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বলতেন। বর্তমানে বহুতল বাড়ি ও ভেপার ল্যাম্পের আলো এই অঞ্চলের ভৌতিক বদনাম একদম মুছে দিয়েছে।

তবে কলকাতায় এখনও অনেক বিখ্যাত ভূতের বাড়ি আছে। যাদের নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা যায়। যেমন ঐতিহাসিক হেস্টিংস হাউস। এর কুখ্যাতি আজও সমান ভাবে বিদ্যমান। ওই বাড়িটি এখনও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে ভারতের প্রথম বড়লাটের জন্য। তিনি নাকি আজও ওই বাড়িতে মাঝে-মাঝেই চলে আসেন। কেন আসেন? সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো অনেকেই জানেন।

তাঁরা আছেন কিংবা নেই তা নিয়ে প্রবল দ্বিমত, তর্কবিতর্ক থাকলেও যাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তাঁরা আছেন, সেইসব মানুষজন অন্ধকার নামলেই নিজেদের সঁপে দিতেন দশরথ-নন্দন 'শ্রীরামচন্দ্র'-এর চরণে। পারতপক্ষে রাতের অন্ধকারে তাঁরা বাড়ির বাইরে বেরতে চাইতেন না। বেরোতে বাধ্য হলে তাঁরা বিড়বিড় করে অবিরাম রামনাম জপতে জপতে কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে আসতেন। রাতে ঘুমোবার সময় তাঁদের ঘরের সমস্ত আলোই ফটফট করে জ্বলত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন দিনের আলোকে যদি 'তাঁরা' ভয় পান, তাহলে ঘরে যদি রাতে আলো জ্বেলে রাখা যায় তাহলে অবশ্যই তেনারা সেই ঘরে প্রবেশ করার সাহস দেখাবেন না। জানি না এইভাবে আলো জ্বেলে সত্যি তাঁদের আটকানো আদৌ সম্ভবপর কিনা!



এবার আপনাদের আমি একটা সত্যি ঘটনা শোনাব। এই গল্পটি আমি শুনেছিলাম এক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মুখ থেকে। আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ আগের ঘটনা। উত্তরবঙ্গের এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে গিয়েছেন কলকাতার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সেই দলে নবীনতম সাহিত্যিক হিসাবে সেই লেখকও ছিলেন। পরবর্তীকালে এক সন্ধ্যার আড্ডায় তিনি আমাদের এই গল্পটা শুনিয়েছিলেন।

সময়টা ছিল শীতকাল। দার্জিলিং মেলে চেপে সদলবলে তাঁরা গিয়ে নামলেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। সেখানে তাঁদের জন্য উদ্যোক্তারা সকাল থেকেই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গোটা তিনেক গাড়িতে ভাগাভাগি করে লেখকরা উঠে পড়লেন। একসময় গাড়ি গিয়ে পৌঁছল তাঁদের জন্য ঠিক করে রাখা বনবাংলোতে। দুপুরের আহারের পর জমে উঠল জমজমাট আড্ডা। কিন্তু কোথাও যেন তাল কেটে যাচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে! আসলে ওই দলের দুই বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের মধ্যে কোনও কারণে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তখন কথা বন্ধ। তাই বিবাদমান দু'জনেই দু'জনের রসিকতায় কোনওরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন না। এইভাবে কখন যেন সময় হয়ে গেল বিকেলের সভার। সেই সাহিত্য সভা শেষে তাঁরা যখন আবার বাংলোয় ফিরলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে। উদ্যোক্তারা প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। আলাদা ঘরে শুতে হবে শোনামাত্র দলের অন্যতম এক প্রবীণ সদস্যের হৃদকম্পন শুরু হল। কারণ, তিনি প্রবলভাবে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এদিকে তাঁর সঙ্গে যিনি রুম শেয়ার করতে পারেন, সেই মানুষটির সঙ্গেই তো আবার তাঁর প্রবল ঝগড়া চলছে।

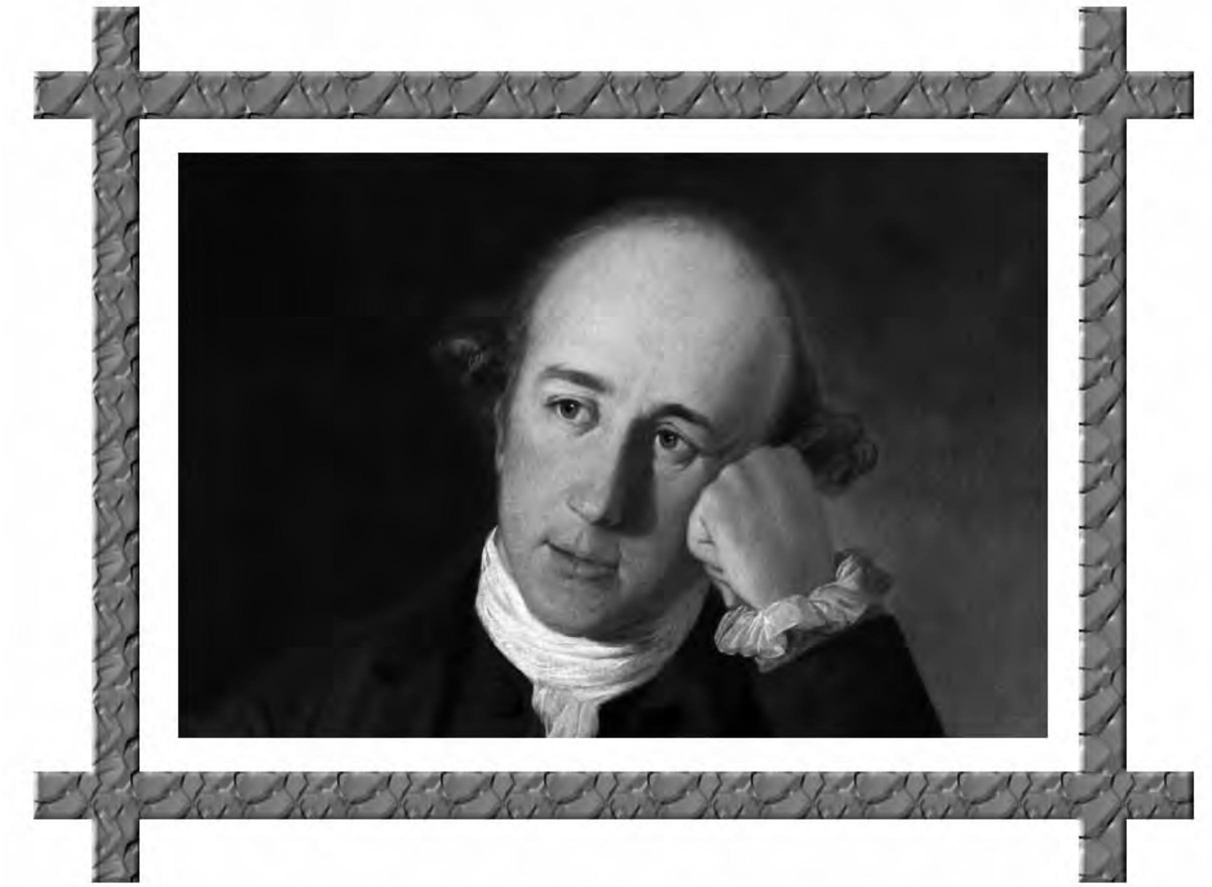
এই পরলোকের বাসিন্দারাই সেই রাতে দুই পুরোনো বন্ধুর বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ভূত বিশ্বাসী সেই প্রখ্যাত লেখক ও সম্পাদক হাতের কাছে রাখা প্যাড টেনে নিয়ে নাকি লিখেছিলেন, 'ঝগড়া আপাতত স্থগিত থাক। আজ রাতে তুমি আমার ঘরে শুতে পারবে কি?' চিঠি পড়ে আর এক বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক মৃদু হেসে বন্ধুর সঙ্গে রাত কাটাতে চলে এসেছিলেন।

ভূত নিয়ে লেখক ও শিল্পীদের আগ্রহ এবং উৎসাহ কোনওকালেই নেহাত কম ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্ল্যানচেট করতেন। তাঁর সেই আসর আলো করে গিয়েছেন বহু বিখ্যাত আত্মা। অপরদিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং প্রেত দর্শন না করলেও তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কাশীতে 'পুত্রের ওপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ সদ্য প্রয়াত পিতার প্রেতকে' কোনও ক্রমে শান্ত করেছিলেন। সেই গল্প কথাসাহিত্যিক তাঁর বন্ধুদের কাছে মাঝে-মাঝেই করতেন।



তখনও 'কপালকুণ্ডলা' লেখার কাজে হাত দেননি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন নেগুয়া (পূর্ব মেদিনীপুর)-তে থাকতেন। কার্যোপলক্ষে তাঁকে একদিন যেতে হয়েছিল নেগুয়ার বাইরে একটি জায়গায়। সেখানে রাত্রিবেলায় তিনিও শুভ্র বসন পরিহিতা এক রমণীকে দেখেছিলেন। ভূতে বিশ্বাস শুধু ভারতীয় লেখক বা শিল্পীরাই করতেন, এরকম ভাবাটা কিন্তু একদমই অনুচিত হবে। ধরা যাক শেক্সপিয়রের কথা। তাঁর লেখায় তাঁদের উপস্থিতি আমাদের বারেবারে নজরে এসেছে। 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেট তাঁর বন্ধু হোরাসিয়োকে কী বলেছিলেন একবার মনে করার চেষ্টা করুন। তিনি বলেছিলেন,

'There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.'



স্বাধীনতা অর্জনের পর কেটে গিয়েছে সাত-সাতটা দশক তবু আমাদের ইংরেজ প্রীতি এতটুকু কমেনি। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকেই সাহেব সেজে থাকতে বেশি ভালোবাসেন। বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তাঁরা। তাই বিদেশি ভূতের গল্প দিয়েই শুরু করব 'ছায়া আছে কায়া নেই'-এর দ্বিতীয় পর্ব।

আলিপুরের বেলভেডিয়ারের বাড়ির গায়ে জড়িয়ে আছে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা। এটি ছিল লাটসাহেবের পুরোনো বাড়ি, বর্তমানে এখানেই গড়ে উঠেছে আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি। এই বাড়িতেই একসময় বসবাস করতেন বহু সুকৃতী ও দুষ্কৃতির নায়ক বাংলার প্রথম গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর আমলেই মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের রেশ তখনও দেশজুড়ে বহাল ছিল।

১৭৭২ থেকে ১৭৮৫—এই তেরো বছরের রাজত্বকালে ওয়ারেন হেস্টিংস শুধু আলিপুরের এই বিলাসগৃহ নয়, তিনি মোট তেরোটি বাড়িতে বসবাস করেছেন। তাঁর এই গৃহ-প্রীতি নিয়ে সেইসময় বিস্তর আলোচনাও হতো। ডব্লু কে ফার্মিংজারের 'থ্যাকারস ক্যালকাটা ডিরেকটরি'-তে আছে, 'হি হ্যাড এ লুক্রেটিভ ম্যানিয়া ফর হাউস বিল্ডিং অ্যান্ড সেলিং।'

হেস্টিংস মানুষটা ছিলেন—চঞ্চল, ছটফটে, উচ্ছৃঙ্খল, প্রবল খামখেয়ালি এবং বেপরোয়া প্রকৃতির। একদিন তাঁর বেলভেডিয়ারের বাড়ির পশ্চিমদিকের বাগানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েলে মেতে উঠেছিলেন দুই যোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এবং অপরজন তাঁরই লাটসভার বিশিষ্ট সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস। এই দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা প্রথম থেকেই মোটেও মধুর ছিল না।

সেইসময় ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের প্রবল ঝগড়া চলছিল। কেউ কেউ মনে করেন মারাঠা যুদ্ধের নীতি নিয়েই তাঁদের দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়েছিল, যা তাঁদের দু'জনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধের ময়দানে। অবশ্য নিন্দুকেরা বলতেন, ওসব নীতি-ফীতি ফালতু কথা। দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এক ফরাসি সুন্দরী, নীলনয়না, শ্বেতাঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে। তাঁর নাম ছিল মাদাম গ্র্যান্ড। শ্বেতাঙ্গিনী, নীলনয়নাই যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মূল কারণ তার কিছুটা আভাস এইচ ই বাস্তিদ তাঁর 'ইকোজ ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা' বইতে দিয়েছেন—"Nearly opposite Alipore Bridge stood two trees, called 'The trees of Destruction', notorious for duels fought under their shade; here Hastings and Francis exchanged shots in the days when European women were few; jealousy often gave rise to these affairs of honour."

১৭ আগস্ট ১৭৮০, সকাল ছ'টায় হেস্টিংসের সহকারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিয়ার্স এবং ফ্রান্সিসের বন্ধু কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটসনের উপস্থিতিতে শুরু হয় ডুয়েল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে ফিলিপ ফ্রান্সিস পরাস্ত হন। বড়লাটের বন্দুক থেকে ছুটে আসা গুলি গিয়ে বেঁধে তাঁর ডানদিকের ঘাড়ে। তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। ফ্রান্সিসকে পড়ে যেতে দেখে হেস্টিংস সহ সবাই ছুটে আসেন।

হেস্টিংস তাঁকে বলেন, আপনার আঘাত তেমন গুরুতর নয় আপনি আমার বাড়িতে চলুন। ফ্রান্সিস ঘৃণাভরে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। তখন ঠিক হল প্রাথমিক শুশ্রূষা করে তাঁকে পালকি করে শহরে পাঠানো হবে। সেইমতো ব্যান্ডেজ বেঁধে তাঁকে তোলা হল পালকিতে। কিন্তু জোয়ারের কারণে বাহকরা পালকি নিয়ে আদি গঙ্গা পার হতে পারল না। তারা আবার ফিরে এল বেলভেডিয়ারের বাড়িতে।

এরপর কেটে গেছে প্রায় দুশো উনচল্লিশ বছর, আদি গঙ্গা দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে অনেক জল। লাটসাহেবের বাড়ির নর্থ গেটটাই নাকি ছিল ওই বাড়ির সদর দেউড়ি। এখনও বহু মানুষ গভীর রাতে লাইব্রেরির বাড়ির দিক থেকে উত্তরদিকের গেটে আহত, রক্তাক্ত ফিলিপ ফ্রান্সিসসহ ওই পালকি বাহকদের এগিয়ে আসতে দেখেছেন।

লেখক সুভাষ সমাজদার সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বীরবাহাদুরের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। সেদিন ওইদিকের গেট-পাহারার দায়িত্বে ছিলেন বীরবাহাদুর। হঠাৎই তাঁর কানে ভেসে এল 'হিপ্পোলো হুকুম্মা', 'হিপ্পোলো হুকুম্মা' শব্দটি। অচেনা শব্দ শুনে তিনি বেশ চমকে উঠেছিলেন। শব্দটা ক্রমশ আরও কাছে চলে এল।

একসময় বীরবাহাদুর দেখলেন, কয়েকজন বাহক একটা পালকি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। আরও কাছে আসার পর তিনি দেখতে পেলেন, পালকির দরজাটা হাট করে খোলা। আর পালকির ভেতরে লম্বা, ঢ্যাঙা চেহারার এক সাহেব দারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাঁর সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাঁর বাঁ-দিকের ঘাড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

এই দৃশ্য দেখে বীরবাহাদুর খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি পুবদিকের(জেলখানার দিকে) গেটের পাহারাদার জামিল শেখের নাম ধরে চিৎকার করতে শুরু করলেন। অমনি, চোখের পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেল জখমি সাহেবের পালকি।

ইংরেজরা আমাদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিয়ে বহুকাল আগেই ভারতছাড়া হয়েছে। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অতৃপ্ত আত্মা আজও নিজের 'গ্রেভ' থেকে উঠে চলে আসেন জাজেস কোর্টের পাশের হেস্টিংস হাউসে। এই বাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি টানা সাতবছর কাটিয়েছিলেন। তারপর ফিরে যান নিজের দেশে এবং সেখানেই পরিণত বয়েসে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে কীসের টানে তিনি তাঁর মাতৃভূমির 'গ্রেভ' ছেড়ে এতবছর বাদেও ছুটে আসেন তাঁর ছেড়ে যাওয়া আবাসস্থলে? একটা কালো কাঠের বাক্স। দেশে ফিরে যাওয়ার সময় যে-কোনও কারণে ওই বাক্সটি খোয়া

যায়। বিদেশে ফিরেও তিনি তার সন্ধানে লোক লাগিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ নেসবিট টমসনকে দুঃখ করে একটা চিঠিও লেখেন—'তোমরা আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া জিনিসগুলো আজও উদ্ধার করতে পারলে না। আমার সেই কালো কাঠের বাক্সের গোপনীয় কাগজপত্রগুলোর জন্য কী মানসিক যন্ত্রণাতেই যে কাটাচ্ছি।'

মিঃ টমসন চেষ্টা করেছিলেন সেই জিনিসগুলোর হদিশ করতে। ১৭৮৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন—'এতদ্দারা সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে প্রাক্তন বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশ হইতে চলিয়া আসার সময় তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়ি কিংবা আলিপুরে তাঁর নূতন বাড়ি হইতে একটা কালো কাঠের বাক্স হয় চুরি না হয় ভুলক্রমে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই জিনিসগুলির সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে মিঃ লারকিনস (হেস্টিংসের বন্ধু) এবং মিঃ টমসন দুই হাজার সিক্কা টাকা দিয়া পুরস্কৃত করিবেন।' কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। পাওয়া যায়নি হেস্টিংসের সেই কালো বাক্সটি।

তাই তিনি নিজেই রাত-গভীরে চার ঘোড়ায় টানা ব্রুহ্যাম গাড়িতে চেপে হেস্টিংস হাউসের বাগান, দোতলার ঘর ও স্নানঘরে খুঁজে বেড়ান তাঁর সেই অতি গোপনীয় কালো কাঠের বাক্সটি। কিন্তু প্রতিরাতেই তাঁকে ফিরতে হয় শূন্য হাতে।

কিন্তু তিনিই যে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তা কী করে জানা গেল? ঐতিহাসিক হেনরি কটন এই ব্যাপারে আলোকপাত করে লিখেছিলেন, 'যে প্রেতমূর্তি গভীর নিশীথে আকুল হয়ে কিছু খুঁজে বেড়ান তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস।' কী ছিল সেই কালো কাঠের বাক্সটিতে, যার টানে হেস্টিংসকে বারে-বারে ফিরে আসতে হয়েছে আমাদের দেশে। সেই বাক্সে ছিল দুটো ছবি এবং হেস্টিংসের ব্যক্তিগত কিছু জরুরি কাগজপত্র ও চিঠি।



শুধুমাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস নন, এই হেস্টিংস হাউসের আনাচে-কানাচে নিত্য রাতে অজস্র অশরীরীর কাণ্ডকারখানায় বহুবার বহু সাহসী মানুষ শিউরে উঠেছেন। আসলে এই বাড়িটির গায়ে 'অভিশপ্ত' তকমাটি অতি সযত্নে লাগিয়েছিলেন স্বয়ং বাংলার প্রথম বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস। এই বাড়িতেই হেস্টিংসের পরবর্তী প্রজন্মের তিন সদস্য অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন। আর এর জন্য এখনও দায়ী করা হয় লাটবাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংসকেই।

সেই কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল হেস্টিংসের বেলভেডিয়ারের বাড়িতে। অন্যান্য নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি সুন্দরী নারীর প্রতিও হেস্টিংসের দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। নারী-প্রীতি তাঁকে বহুবার বহু সমস্যায় ফেলেছে। মেরি গ্র্যান্ডের পাশাপাশি তিনি আর এক নীলনয়না সুন্দরী, ব্যারন ইমহফের স্ত্রী মেরিয়ান ইমহফের প্রেমেও প্রবলভাবে পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

পরস্ত্রী ইমহফকে কাছে পাওয়ার জন্য তিনি ব্যারনকে বাধ্য করেছিলেন সস্ত্রীক বেলভেডিয়ারের বাড়িতে বসবাস করতে। ব্যারন খুব ভালোভাবেই জানতেন তাঁর স্ত্রীর প্রতি হেস্টিংসের দুর্বলতার কথা, কিন্তু তিনি বড়লাটের আদেশ কোনওভাবেই অমান্য করার সাহস দেখাতে পারেননি।

এই বাড়িতে আসার কয়েকমাস পরেই হেস্টিংস ব্যারনকে কোম্পানির কাজে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ বলেন স্বয়ং ব্যারন মনের দুঃখে স্ত্রী মেরিয়ানকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, বউ হারালে আবার বউ পাওয়া যাবে, কিন্তু বড়লাটের কোপে প্রাণটা গেলে স্থায়ী ঠিকানা হবে গ্রেভইয়ার্ডে।

ব্যারন কোথায় গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও মেরিয়ানকে নিজের মতো করে পেতে হেস্টিংসের সামনে এরপর আর কোনও বাধা রইল না। ব্যারন উধাও হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই গভীর রাতে বেলভেডিয়ার দোতলার ঘরটি হেস্টিংস ও মেরিয়ানের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত।

সাতটা বছর মেরিয়ান ইমহফ এই বাড়িতেই বসবাস করেছিলেন। সন ১৭৭৭। হেস্টিংস তাঁর নতুন ঘরনি মেরিয়ান ইমহফকে নিয়ে উঠে এলেন হেস্টিংস হাউসে। বড়লাট মনের মতো করে তাঁর এই প্রাসাদটিকে সাজিয়েছিলেন। আরণ্যক পরিবেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাসাদটির সৌন্দর্যের কথা তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরত। ওয়ারেন হেস্টিংসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শ্যালক, মিঃ ম্যাক্রাবি তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'জ্যোৎস্না-ভরা চাঁদনি রাতে সাদা ধবধবে এই বাড়িটির আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।'

১৭৭৭ থেকে ১৭৮৪ হেস্টিংস হাউসে মোট সাত বছর সস্ত্রীক বড়লাট বসবাস করেছিলেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিসেস হেস্টিংস দেশে ফিরে যান এবং পরের বছর দেশে ফেরেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আর তার কয়েক বছর পর থেকেই শুরু হল যত কিছু সমস্যা। হেস্টিংস হাউস হয়ে উঠল জমজমাট ভূতের আড্ডাখানা। কিন্তু কেন? তার পিছনে রয়েছে একটা করুণ ইতিহাস, এক অতৃপ্ত আত্মার প্রতিশোধ নেওয়ার কাহিনি।

হেস্টিংস দেশে ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর এই বিশাল সম্পত্তি অর্থাৎ হেস্টিংস হাউস দান করেন তাঁর স্ত্রী মেরিয়ান ইমহফের প্রথম পক্ষের পুত্র (ব্যারন ইমহফের ঔরসজাত), জুলিয়াস ইমহফকে।

হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে যাওয়ার তিনবছর বাদে ১৭৮৮ সালে জুলিয়াস রাইটারের চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। ১৭৮২ সালে তিনি রাইটার থেকে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর হন। পরবর্তীকালে জুলিয়াস ইমহফ প্রোমোশন পেয়ে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও কাজ করেছিলেন।

জুলিয়াস তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান উইলিয়াম, চার্লস এবং জনকে নিয়ে হেস্টিংস হাউসেই বসবাস করতেন। এই বাড়িতেই তাঁর তিন পুত্র অপঘাতে মারা যায়।

বড় ছেলে উইলিয়ামের বয়স তখন দশ বছর। চমৎকার মায়াবী এক আলো-মাখা বিকেলে সে হেস্টিংস হাউসের কম্পাউন্ডে খেলছিল। হঠাৎই শুরু হল প্রবল ঝড়। ধুলোয় ঢেকে গেল চর্তুদিক। সেইসময় উইলিয়াম দেখতে পেল দীর্ঘদেহী এক মানুষকে। সেই ছায়া মূর্তির তীব্র ঘৃণা-ভরা চাউনিতে শিউরে উঠেছিল দশ বছরের উইলিয়াম। প্রবল ভয় পেয়ে সে ছুটতে শুরু করে। কোনওক্রমে ঘরে ঢুকে সে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে।



সেদিন রাতেই উইলিয়াম প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল। এরপর সে বেঁচেছিল মাত্র তিনদিন। এই মৃত্যুর কিছুদিন বাদেই ওই কম্পাউন্ডে উইলিয়ামের পরের ভাই চার্লসকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা। তিনি ছিলেন চার্লসের আয়া। চার্লসও আর ঘরে ফিরতে পারেনি। হেস্টিংস হাউসের পাতকুয়োতে কোনওভাবে পড়ে গিয়ে সেদিন তার মৃত্যু হয়। আয়া সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে চার্লস কুয়োতে পড়েছিল সে রহস্যের উন্মোচন আজও হয়নি।

জুলিয়াসের ছোটপুত্র জন অবশ্য কিছুদিন পৃথিবীতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেশ বড় হওয়ার পর কোনও গুপ্ত আততায়ীর হাতে তাঁর প্রাণ যায়।

তিন পুত্রকে অকালে হারিয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন জুলিয়াস। তিনি তাঁর সৎ পিতা ওয়ারেন হেস্টিংসকে পরবর্তীকালে একটি করুণ চিঠি লিখেছিলেন—'In the grounds between Hasting's House and the Judge's court my three children William, Charles and John lie buried...'

উইলিয়াম যে দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তিকে দেখে ভয় পেয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল তাঁর পরিচয় পরবর্তীকালে কিছুটা হলেও আমরা জানতে পেরেছি। হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব সেই ছায়ামূর্তিকে গভীর রাতে জাজেস কোর্টের প্রাচীরের কাছে যাঁরা ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। তাঁরা বলতেন, তিনি আর অন্য কেউ নন, মেরিয়ান ইমহফের প্রথম পক্ষের স্বামী ব্যারন ইমহফ। অনেকেই মনে করতেন, মেরিয়ানকে কাছে পাওয়ার জন্য অতি সুকৌশলে ব্যারনকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন হেস্টিংস। তাই পরপার থেকে হেস্টিংস ও মেরিয়ানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অশরীরী ব্যারন মাঝে-মাঝেই ছুটে আসতেন হেস্টিংস হাউসে।

এখন এই হেস্টিংস হাউসেই গড়ে উঠেছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। যখন এখানে হস্টেল ছিল, তখন সেখানকার আবাসিকরাও মাঝেমাঝেই নিশি রাতে ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ শুনতে পেতেন। শুধু তাই নয়, মাঝরাতে ওই বাড়ির হলঘরে দীর্ঘদেহী এক ছায়ামূর্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন অনেকেই।

পুরনো কলকাতার ইতিহাস ও সরকারি নথিপত্রে এই হেস্টিংস হাউসের কুখ্যাতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে বলা হয়েছে—'For Calcutta tradition connects the "House" with a famous ghost.'



ভদ্রলোকের নাম জেমস গ্রাহাম। অবস্থাপন্ন ব্যাবসায়ী। ইংল্যান্ডের ডারহামশায়ার শহরের বাইরে বেশ ক'টি যাঁতা পেষার কল নিয়ে তাঁর বড়সড় কারখানা। কর্মঠ মানুষ। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তিনি সময়মতো কারখানায় আসেন। তবে তাঁর বাড়ি ফেরার কোনও ঠিক থাকে না। প্রায়দিনই কাজের চাপ বেশি থাকে তাই বাড়ি ফিরতেও তাঁর বেশ রাত হয়ে যায়। প্রতিদিনই কাজ শেষ হওয়ার পর কারখানা বন্ধ করে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে নিয়ে তিনি হেঁটেই বাড়ি ফেরেন।

সেদিন সকাল থেকেই আবহাওয়াটা মোটেই ভালো ছিল না। একে শীতকাল, তার ওপর গতকাল রাত থেকেই প্রবল তুষার পাত শুরু হয়েছে। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তেমন কোনও সমস্যা অবশ্য হয়নি। রাস্তায় বেরিয়েই তিনি একটা গাড়ি পেয়ে গিয়েছিলেন। কারখানায় পৌঁছেই তিনি কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা তাঁর মাথাতেই ছিল না। সেদিন আবার কাজের চাপও যথেষ্ট ছিল। সব যখন মিটল তখন রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে। কারখানা বন্ধ করে, আপাদমস্তক শরীর ঢেকে, লণ্ঠন হাতে তিনি রাস্তায় নেমে এলেন।

তখনও সমানতালে তুষারপাত হচ্ছে। লন্ডনের শীত মানেই দুর্ভোগ। প্রবল ঠান্ডা, রাস্তায় একটা প্রাণীকেও দেখা যাচ্ছে না। গ্যাস লাইটের আলোগুলোও যেন ঠান্ডার চোটে আরও ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে। রাস্তায় নেমেই গ্রাহাম বুঝতে পেরেছিলেন আজ কপালে অনেক কষ্ট আছে। আর তখনই শৈত্যপ্রবাহ হঠাৎ করে যেন আরও বেড়ে গেল। সেই কনকনে হাওয়া শরীরের সমস্ত পোশাক ভেদ করে হাড়ের ভিতরে ছোবল মারতে শুরু করল।

বিরক্ত গ্রাহাম খুব সাবধানেই পথ চলছিলেন। বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎই তিনি দেখতে পেলেন এক ভদ্রমহিলা দ্রুত তাঁর দিকে হেঁটে আসছেন। শীতের রাতে একাকী এক মহিলাকে এই রাস্তায় দেখে গ্রাহাম বেশ অবাকই হলেন। ইতিমধ্যে সেই মহিলা প্রায় তাঁর সামনে চলে এসেছেন। অভদ্রতা জেনেও গ্রাহাম হাতের লণ্ঠনটা তুলে মহিলার মুখটা দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তুষারের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেই মহিলা তাঁর মাথা ও মুখ প্রায় মুড়ে ফেলেছেন।

মহিলাটি গ্রাহামের সামনে এসে বললেন, মিস্টার গ্রাহাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

গ্রাহাম মহিলার কথা শুনে যথেষ্ট অবাক ও বিস্মিত হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না, বরঞ্চ বেশ গম্ভীর ভাবেই বললেন, ম্যাডাম, আপনি কি আমাকে চেনেন! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার পূর্বপরিচিতা। কারণ আপনি আমার নামটাও জানেন।

উত্তরে সেই মহিলা বললেন, অবশ্যই আমরা একে অপরকে খুব ভালোভাবে চিনি। আমি আপনাকে আমাদের বাড়িতে বহুবার দেখেছি। আপনি আমার হাতের চা খেয়ে কতবার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এখন সে কথা থাক। আজ আপনাকে আমার বড় দরকার। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

গ্রাহাম বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাহায্য করব। তবে সেইসব কথা তো দিনের বেলায় আমার কারখানায় এসেও বলতে পারতেন। আজ এরকম দুর্যোগ, তারপর রাতটাও কম হয়নি। সময় নির্বাচনটা আপনার সঠিক হয়নি।

মহিলা বললেন, দিনের আলো আমি এখন একদম সহ্য করতে পারি না। আমি জানি, আপনি রোজই প্রায় এইসময় বাড়ি ফেরেন। তাই আজই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

গ্রাহাম মৃদু হেসে বললেন, এসেই যখন পড়েছেন তখন বলুন আপনার দরকারটা। তারপর দেখব কীভাবে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আপনার মাথা-মুখ যেভাবে ঢেকে রেখেছেন তাতে আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনার নামটা যদি জানান তাহলে আমার কথা বলতে সুবিধা হয়।

মহিলা বললেন, আমার নাম মিস ক্যামেলিয়া।

নামটা শুনে চমকে উঠলেন জেমস গ্রাহাম। তিনি বললেন, মিস ক্যামেলিয়া, আপনি তো আজ থেকে মাস ছয়েক আগে আমাদের বন্ধু মার্ক সার্পের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মার্ক কেমন আছে? আপনারা কি আবার ফিরে এসেছেন?

মিস ক্যামেলিয়া বললেন, না, আমি কারও সঙ্গে পালাইনি। গত ছ'মাস ধরে আমি এই শহরেই রয়েছি। তবে এখন আমি বড় কষ্টে আছি। আপনি দয়া করে আমাকে বাঁচান।

কে ছিলেন এই মিস ক্যামেলিয়া! তাঁর কথা জানতে হলে আমাদের একবার ঘুরে আসতে হবে ডারহামশায়ারের চেস্টার লি স্ট্রিট থেকে। এই এলাকাতেই বসবাস করেন জেমস গ্রাহামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মিস্টার ওয়াকার। বিত্তশালী মানুষ। বিশাল দুর্গের আকারের না হলেও তাঁর বাড়িটা নেহাত ছোট নয়। অর্থ, প্রতিপত্তি থাকলেও ওয়াকারের স্ত্রী ভাগ্য মোটেই সুখের নয়। বেশ কয়েক বছর আগে খুব ঘটা করে এক সুন্দরী মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন বাদেই তাঁর স্ত্রী কয়েকদিন ভুগেই মারা যান। তারপর থেকেই ওয়াকারের একাকী দিনযাপন শুরু হয়েছে। মাঝে-সাঝে বন্ধুবান্ধবরা বাড়িতে আড্ডা মারতে এলেও তাঁরা বিদায় নেওয়ার পর পুরো বাড়িটা যেন তাঁকে গিলে খেতে আসে। প্রবল নিঃসঙ্গতায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক এমন সময় তাঁদেরই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া মিস ক্যামেলিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে আসেন। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মিস ক্যামেলিয়া সেইসময় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি মিঃ ওয়াকারের কাছে নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে আশ্রয় চাইলেন।

ওয়াকার বললেন, তুমি আমার বাড়িতে অবশ্যই থাকতে পারো। এত বড় বাড়িতে আমি আর একা থাকতে পারছি না। আমার বাড়িতে এতগুলো ঘর রয়েছে, তুমি যে-কোনও একটা ঘরে থাকো। তবে

তোমাকে নিজের হাতে এই ঘর-গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সামলাতে হবে।

মিস ক্যামেলিয়া ওয়াকারের প্রস্তাবে এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। ক'দিনের মধ্যেই নারীর হাতের পরশে আবার আগের চেহারা ফিরে পেল চেস্টার লি স্ট্রিটের ওয়াকারের বাড়িটি। কিন্তু ক্যামেলিয়ার কপালে সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। যেমনভাবে তিনি একদিন এই বাড়িতে এসেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই এক বিকেলে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন সেই সুন্দরী মেয়েটি।



ঝুপ ঝুপ করে অবিরাম ঝরে চলেছে তুষার। রাস্তা প্রায় বরফে ঢেকে গিয়েছে। জেমস গ্রাহামের সামনে তখনও সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন মিস ক্যামেলিয়া। তীব্র তুষারপাত ও ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা মিঃ গ্রাহামের পক্ষেও সহ্য করা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছিল। তিনি অধৈর্য কণ্ঠে মিস ক্যামেলিয়াকে বললেন, আমি আর একমুহূর্ত এখানে সময় নষ্ট করতে পারব না। রাত অনেক হল, আপনি এখন কোথায় থাকেন বলুন? আমি আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়েই না হয় বাড়ি ফিরব!

মিস ক্যামেলিয়া করুণ হেসে বললেন, আমার বাড়ি? আপনি সেখানে তো এখন কোনওভাবেই যেতে পারবেন না।

মিস ক্যামেলিয়ার এই কথায় গ্রাহামের শরীর জুড়ে হিমশীতল এক তরঙ্গ বয়ে গেল। তিনি বললেন, তার মানে?

ক্যামেলিয়া বললেন, আমি এখন আর আপনাদের এই জগতের বাসিন্দা নই। ছ'মাস আগে আপনার বন্ধু সার্প ঠান্ডা মাথায় আমাকে খুন করেছে।

ক্যামেলিয়ার কথা শুনে চমকে উঠলেন গ্রাহাম। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, এই মাঝরাতে আপনি আমার সঙ্গে মজা করছেন?

ক্যামেলিয়া বললেন, আপনার লণ্ঠনটা একবার দয়া করে আমার মুখের কাছে তুলবেন। মিঃ গ্রাহাম, আপনার কোনও ভয় নেই। আমি আপনার কোনও ক্ষতি করব না। আমি শুধু আমার হত্যাকারীর চরম শাস্তি চাই। আপনাকে আমি সব কথা জানাব। আপনি শুধু দয়া করে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তদন্ত করার অনুরোধ করবেন।

ক্যামেলিয়ার কথামতো লণ্ঠনটা মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে চমকে উঠলেন গ্রাহাম। দেখলেন, মুখের আবরণীটা সরিয়ে দিয়েছেন মিস ক্যামেলিয়া। ভয়ংকর, ভয়াবহ এক দৃশ্য। মাথার পিছন দিক থেকে তখনও রক্ত ঝরছে, চুলগুলো রক্তে ভেজা। ভারী কোনও অস্ত্রের আঘাতে ডান কানের পাশটা একদম থেঁতলে গিয়েছে।

শিউরে উঠলেন মিঃ গ্রাহাম। বললেন, সার্প কেন আপনাকে খুন করবে?

খুব ক্লান্ত কণ্ঠে ক্যামেলিয়া বললেন, আপনার বন্ধু ওয়াকারের নির্দেশে।

অবাক গ্রাহাম বললেন, কেন! ওয়াকার আপনাকে মারল কেন?

ক্যামেলিয়া বললেন, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই ঠান্ডায় আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে, তবু দয়া করে শুনে যান।

মিস ক্যামেলিয়া বলতে শুরু করলেন। ওয়াকারের আশ্রয়ে আসার পর প্রথম তিন মাস আমার খুব সুখেই কেটেছিল। এরপরই শুরু হল অত্যাচার। প্রতিরাতেই ওয়াকার আমাকে বাধ্য করতেন তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হতে। ফলস্বরূপ, একদিন আমার শরীরে মাতৃত্বের চিহ্ন ফুটে উঠল। একটা সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের নজরে এল ব্যাপারটা। কুৎসা, নিন্দামন্দ করতে শুরু করলেন তাঁরা। ওয়াকারকে চরিত্রহীন বলতেও তাঁরা দ্বিধা করলেন না। মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে দেখে সার্পের শরণাপন্ন হলেন ওয়াকার। ঠিক হল আমাকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হবে। একদিন রাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ওয়াকার আমাকে বললেন, ক্যামেলিয়া, এই অবস্থায় তোমার এখানে থাকা ঠিক নয়। আমার বন্ধু সার্পকে তো তুমি খুব ভালোভাবেই চেনো। শহরের বাইরে আমার বন্ধুর একটা বাড়ি আছে। কাল বিকেলে সার্প এসে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। সন্তান প্রসবের পর তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি ওয়াকারের কথায় সম্মতি জানিয়েছিলাম, কারণ আমার জন্য তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট হোক, তা আমি চাইনি। জানেন মিঃ গ্রাহাম, আমি সত্যিই ওকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। সেদিন বুঝিনি তবে আজ বুঝতে পারছি জীবনের মারাত্মক ভুলটা করেছিলাম ওয়াকারের কাছে আশ্রয় চেয়ে। সেই ভুলের চরম মূল্য আমাকে জীবন হারিয়ে দিতে হল। একটা নয়, দু-দুটো খুন করেছে ওয়াকার ও সার্প। আমার গর্ভের সন্তানটি তো কোনও অন্যায় করেনি তবু ওকেও মরতে হল আমার জন্য। মিঃ গ্রাহাম দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

নির্বাক হয়ে গ্রাহাম এতক্ষণ কথা শুনছিলেন, মিস ক্যামেলিয়া চুপ করামাত্রই তিনি জানতে চাইলেন, তারপর কী হল?

করুণ হেসে ক্যামেলিয়া বললেন, সেদিন বিকেলবেলায় সার্প তার গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসামাত্রই ওয়াকার আমার দুটো হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে বলেছিল, ডার্লিং, মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার, সব মিটে গেলে তুমি আমাদের সন্তানকে নিয়ে আবার ফিরে আসবে আমার কাছে। আমি তোমাকে তখন বিয়ে করব। মিঃ গ্রাহাম, আমার মতো নির্বোধ মেয়ে আপনি জীবনে বোধহয় আর একটাও দেখেননি। সেই সন্ধ্যায় আমি শেষবারের মতো প্রতারিত হলাম।

গ্রাহাম নিজের ওভারকোট থেকে তুষার কণা ঝেড়ে নিয়ে জানতে চাইলেন, সার্প আপনাকে কোথায়, কীভাবে খুন করল?

ক্যামেলিয়া বললেন, রাস্তার ওই বাঁকের মুখটায় আপনাকে একবার কষ্ট করে যেতে হবে। সেদিন ওইখানে গাড়িটা আসার পর সার্প বলেছিল, আজ গোটা দিন জুড়ে সারা শহর টহল মারতে হয়েছে। ঘোড়াগুলো একটুও বিশ্রাম পায়নি। এই ফাঁকা জায়গাটায় খানিকক্ষণ আমরা দাঁড়াব। মিস ক্যামেলিয়া আপনি নীচে নেমে আসুন। একটু পরেই আমরা আবার রওনা হব। মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে ছিল। বারবার ওয়াকারের কথা মনে পড়ছিল। সার্পের কথামতো আমি গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলাম। সার্প তখন আমার সন্তান, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছিল। আমার ওই বকবকানি একটুও ভালো লাগছিল না। কিছুক্ষণ একা থাকতে ইচ্ছা করছিল। তাই আমি একটু পিছিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। সার্প এই

সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। একটা ভারী লোহার রড দিয়ে আমার ডান কানের পিছনে সপাটে আঘাত করেছিল। আমি রাস্তায় লুটিয়ে পড়ার পরও সার্প কিন্তু ওই রড দিয়ে আমার শরীরে ক্রমাগত আঘাত করে গিয়েছে। তারপর আমার প্রাণহীন দেহটা টেনে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে ওই জলাটার পাশে। ওখানেই আমি এখন শুয়ে আছি। তবে মিঃ গ্রাহাম, সার্পের মোজা ও টাইতে রক্ত লেগে গিয়েছিল। মোজা, টাই-এর সঙ্গে লোহার রডটাও ওই গর্তেই ফেলে দিয়েছিল সার্প। মিঃ গ্রাহাম প্লিজ, আমাকে সাহায্য করুন।

গ্রাহাম বললেন, আমি চেষ্টা করব আপনাকে সাহায্য করতে।

মৃদু হেসে ক্যামেলিয়া নিমেষে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।



দীর্ঘ পথ, তবু ধ্বস্ত শরীরটাকে কোনওক্রমে টেনে হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন জেমস গ্রাহাম। ভোর হতে তখন আর বেশি দেরি নেই। সপসপে ভেজা পোশাকগুলো ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে অবসন্ন ও প্রায় অসুস্থ গ্রাহাম নিজের শরীরটাকে টেনেটুনে তুললেন শয্যার কোলে। কিন্তু ঘুম কোথায়! ছোটোবেলার ঘুম আসার টোটকা—অসংখ্য সাদা ভেড়াকে বেড়া পার করানো সত্ত্বেও চোখে তো এখনও একফোঁটা ঘুম নেমে এল না। চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল মিস ক্যামেলিয়ার সেই ভয়াবহ চেহারাটা। অথচ মহিলা যে মৃত তা মানতেও নারাজ তাঁর যুক্তিবাদী মন। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রবল একটা ঝড় উঠেছিল। যা দেখলাম তা অলৌকিক, না মনের ভুল এই চিন্তাতেই তিনি ডুবে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। এক এক সময় তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যা দেখেছেন সেটা পুরোটাই মনের বিভ্রম। কারণ প্রেতের শরীর থেকে কীভাবে রক্তক্ষরণ হবে, তাও আবার টাটকা রক্ত।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতেই কখন যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই ঘুম ভাঙল অলস মধ্যাহ্নের বিদায় বেলায়। দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠেছিলেন। কারণ এই সময়ে আর কারখানায় গিয়ে কোনও লাভ হবে না। অথচ সেখানে পড়ে রয়েছে অজস্র কাজ। বহুবছর বাদে তিনি আজ কারখানায় পৌঁছতে পারলেন না।

দ্রুত বিছানা ছেড়ে সেরে ফেললেন প্রাত্যহিক কাজকর্ম। তারপর এককাপ কফি ও কিছু খাবার নিয়ে তিনি ড্রইং রুমে এসে বসলেন। বেশ খানিকটা কফি পান করার পর তিনি ঠিক করলেন, আমি ক্যামেলিয়ার কথামতো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাব না। আমি যাব আমার বন্ধু ওয়াকারের কাছে। তার কাছ থেকেই প্রথমে সবকিছু জানব।

দুপুরের পর থেকেই তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহাম দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নেমে এলেন তাঁর বিশাল বাগানের সামনের অংশে। এখান থেকে খানিকটা হাঁটলেই তিনি পৌঁছে যাবেন মূল সড়কে। তিনি পা বাড়ালেন সেইদিকেই। হঠাৎই তাঁর নজর গেল বাগানের পপলার গাছটার দিকে।

সেই গাছের নীচে কালকের সাদা পোশাক পরে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন মিস ক্যামেলিয়া। তিনি ইশারায় গ্রাহামকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। গ্রাহাম পপলার গাছের কাছে যাওয়া মাত্র ক্যামেলিয়া জানতে চাইলেন, মিঃ গ্রাহাম আপনি আজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেলেন না কেন?

গ্রাহাম বললেন, এই তো যাব বলেই বেরিয়েছি। আজ সমস্ত কথা তাঁকে জানিয়ে হেস্তনেস্ত করেই ফিরব।

ক্যামেলিয়া হিসহিস করে বললেন মিথ্যে কথা! আপনি যাচ্ছেন ওয়াকারের বাড়ি। গ্রাহাম এই ভুলটা আপনি করবেন না। আমি তাহলে বাধ্য হবো আপনাকে কঠিন শাস্তি দিতে। আপনি বেঘোরে মরবেন।

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে গ্রাহাম বললেন, আপনি তো নিজের হাতেই ওই দু'জনকে মারতে পারেন। তাহলে এর মাঝে আমাকে কেন টেনে আনছেন?

মিস ক্যামেলিয়া বললেন, এক চুটকিতে মেরে দিতে পারি ওই দুটোকে। কিন্তু তাতে আমি শান্তি পাব না। তাহলে ওই শয়তানগুলো কীভাবে দুটো নিরীহ প্রাণকে হত্যা করেছে তা সকলেরই অজানা থেকে যাবে। তাই আমি চাই তারা আইনমাফিক যথাযোগ্য শাস্তি পাক। গ্রাহাম আপনি ঘরে ফিরে যান, কাল সকালে উঠেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সব জানাবেন। তা নাহলে কী হবে তা আপনি ধারণা করতে পারছেন না।

অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন গ্রাহাম। বেশকিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফেরার পর তিনি আর ক্যামেলিয়াকে সেখানে দেখতে পাননি। কোনওক্রমে তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

পরের দু'দিন কারখানায় গেলেও ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িমুখো হলেন না গ্রাহাম। কেন তিনি গেলেন না! গ্রাহাম ভেবেছিলেন, ক্যামেলিয়ার অশান্ত আত্মা যখন তাঁর দুই হত্যাকারীকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারছে না, তখন সে আমার কী ক্ষতি করবে!

এইরকম ভেবে বড় ভুল করেছিলেন গ্রাহাম। তৃতীয় দিন যথাসময়ে কারখানায় পৌঁছলেন। শুরু করলেন জোরকদমে কাজ। বিকেলবেলায় একটু বিশ্রাম নিতে তিনি বেরিয়ে এলেন কারখানার বাইরের বাগানে। সেখানে তিনি একটি পরিত্যক্ত যাঁতাকলের সামনে দাঁড়িয়ে সবে চুরুটটি ধরিয়েছেন ঠিক তখনই একটা প্রবল ঝড় উঠল। আধভেজা শুকনো পাতার ওড়াউড়ির ব্যর্থ চেষ্টা থেমে যাওয়ার পর গ্রাহাম দেখতে পেলেন মিস ক্যামেলিয়াকে। এবার আর সর্বাঙ্গ ঢাকা নয়, এখনও মাথা থেকে চুঁইয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে তাঁর ঘাড়ে। মাথাটা হেলে আছে একদিকে, বীভৎস এক চেহারা। আর চোখ দিয়ে যেন তাঁর আগুন ঝরছে।

কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন, মৃত্যুর জন্য তুমি তৈরি হও। আমার কথা অমান্য করার শাস্তি তোমাকে আজ পেতেই হবে। ভীত গ্রাহাম কাঁপতে কাঁপতে নতজানু হয়ে ক্যামেলিয়ার সামনে বসে পড়ে হাতজোড় করে বললেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কাল সকালেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সব কথা জানাব।

ক্যামেলিয়া বললেন, এটাই কিন্তু তোমার শেষ সুযোগ।

পরদিন সকালে গ্রাহাম ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললেন। সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আপনার প্রলাপ শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই। আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান। তা নাহলে আমি আপনাকে পাগলাগারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের অদৃষ্টকে গালাগাল করতে করতে রাস্তায় নেমে এলেন গ্রাহাম। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেটও দপ্তরে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠেই দেখতে পেলেন, সাদা পোশাক পরিহিতা এক মহিলা তাঁর পাশের আসনে আগে থেকেই বসে আছেন। তাঁর ডান কানের পাশ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে। ঘাড়টা হেলে আছে একদিকে। একটু ঘাবড়ে গেলেও ম্যাজিস্ট্রেট গম্ভীর ভাবে মহিলার পরিচয় জানতে চাইলেন।

মহিলা বললেন, স্যার, ভয় পাবেন না। আমি ক্যামেলিয়া। মিঃ গ্রাহাম একটু আগে আপনাকে এসে যা বলে গিয়েছেন তা সবটাই সত্যি। কথা শেষ করেই বাতাসে নিমেষে মিলিয়ে গেলেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তরে

পৌঁছেই পুলিসকে নির্দেশ দিলেন মিস ক্যামেলিয়াকে খুঁজে বের করার জন্য। পুলিস যোগাযোগ করলেন গ্রাহামের সঙ্গে। তাঁর চিহ্নিত করা জায়গায় গর্ত খুঁড়ে পুলিস ক্যামেলিয়ার মৃতদেহ ও সার্পের রক্তমাখা টাই, মোজা এবং খুনের হাতিয়ার সেই লোহার রডটিও উদ্ধার করল।

শীতকাল বলে ক্যামেলিয়ার শরীরে তখনও তেমন ভাবে পচন ধরেনি, ফলে তখনও তাঁকে চেনা যাচ্ছিল। গ্রেপ্তার করা হল সার্প ও ওয়াকারকে। ডারহামের আদালতে শুরু হল বিচার। বিচারক সার্পকে চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও ওয়ারককে দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এরপর আর কোনওদিন, কখনও জেমস গ্রাহামের সঙ্গে মিস ক্যামেলিয়ার দেখা হয়নি। হয়তো গ্রাহামের সাহায্যে দুই অপরাধীকে চরম শাস্তি দিয়ে মিস ক্যামেলিয়া তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়ে চিরতরে চিরশান্তির দেশে চলে গিয়েছিলেন।



মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। ১৮৪০ সালে যশোর জেলার পলুয়া-মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজেও পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি আবার ফিরে যান নিজের গ্রাম মাগুরায়।

পরবর্তীকালে বেশ কিছুদিন তিনি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর লেখা নীলকর বিরোধী প্রবন্ধগুলি মানুষকে আরও ইংরেজ বিরোধী করে তুলেছিল। পরে কলকাতায় মুদ্রণের কাজ শিখে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিজগ্রামে সেটি স্থাপন করেন। শুরু হয় প্রকাশনার কাজ। পাক্ষিক সেই পত্রিকাটির নাম ছিল 'অমৃত প্রবাহিণী'। বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। সারা ভারতের মানুষ তাঁকে সেইসময় একডাকে চিনতেন এবং এখনও চেনেন। মহাত্মা শিশিরকুমারও একসময় প্রবলভাবে প্রেতচর্চার দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই কারণে তিনি একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিন'।

এইসময়ই শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয় থিওজফিক্যাল সোসাইটির দুই প্রখ্যাত কর্মকর্তা, মাদাম ব্ল্যাভাটস্কী ও কর্নেল অলকটের। তাঁদের সহায়তায় এবং তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় থিওজফিক্যাল সোসাইটির গোড়াপত্তন হয়। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার লিখছেন, 'আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা হইতে ব্ল্যাভাটস্কী নাম্নী একটি মেম ও অলকট নামক এক সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী, সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন।

এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম।'

একটা সময় শিশিরকুমার ঘোষ 'তাঁদের' অর্থাৎ প্রেতলোক সম্পর্কে আরও অনেককিছু জানবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে খবর ছিল আমেরিকায় প্রেতচর্চা খুবই উন্নতি লাভ করেছে। সেইকারণে তিনি আমেরিকায় যাবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু যে-কোনও কারণে তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু কেন মহাত্মা শিশিরকুমার প্রেতলোকের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন? কেন তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রেতচর্চা? একটি আত্মহত্যা। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহের ভাই হীরালাল হঠাৎই আত্মহত্যা করেন। তিনি তাঁর এই ভাইকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। সেই ভাইয়ের মৃত্যুতে শিশিরকুমার প্রায় পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করেছিলেন। প্রিয় ভাইয়ের অকালে চলে যাওয়া তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। অন্য জগতে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের সঙ্গে যে-কোনও উপায়ে তিনি একবার যোগাযোগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে! তাঁকে কেউ একজন প্ল্যানচেট করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর কথামতো শিশিরকুমার প্ল্যানচেট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এমন মানুষের সন্ধান করতে শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানুষটির খোঁজ পেলেন।

এইসময় শোকস্তব্ধ শিশিরকুমার পাশে পেলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরকে। তিনি তখন কলকাতায়। শিশিরকুমার চলে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে। সেইসময় সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি প্রেতবিশারদ হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। নিজের বাড়িতে প্রায় নিয়মিত তিনি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে প্ল্যানচেটের আসর বসিয়ে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেই আসরে থাকতেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব-জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো প্রখ্যাত মানুষজন। শোনা যায় তাঁরা সকলেই প্রেতাত্মা-চর্চায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। সেই দলের নেতা প্যারীচাঁদ মিত্রের তত্ত্বাবধানেই শুরু হল শিশিরকুমার ঘোষের প্রেতচর্চার শিক্ষা এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনিও এ ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু হীরালাল ঘোষ কেন আত্মহত্যা করেছিলেন! খুব সম্ভবত তিনি প্রবল মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই আত্মহত্যা সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোকপাত করেছেন ঘোষ পরিবারের এক সদস্য মৃণালকান্তি ঘোষ। তিনি লিখছেন, 'আমার পিতামহী অমৃতময়ী নয় বৎসর বয়েসে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সংসার করিতে আরম্ভ করেন। আটটি পুত্র, তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্রবধূ ও দুই-তিনটি পৌত্র-দৌহিত্র রাখিয়া হরিনারায়ণ গোলোকগত হইলেন, আমার পিতামহী এ পর্যন্ত শোক-দুঃখের মুখ দেখেন নাই। এই তাঁহার প্রথম শোক। সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বগুণান্বিত স্বামীকে হারাইয়া তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মাতৃভক্ত সন্তানেরা জননীর শোকভার লাঘব করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার পঞ্চম পুত্র হীরালাল ছিলেন মাতৃগত প্রাণ। মাতাঠাকুরানির শোকসন্তপ্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি দিবানিশি মাতার কাছে থাকিয়া—একরূপ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হীরালালের হৃদয় ছিল অতিশয় কোমল। জীবের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সকল সময় আপন ইচ্ছানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য কখনও কখনও আবেগ ভরে বলিতেন—''জীবের দুঃখ দূর করিতে যদি নাই পারিলাম তবে বাঁচিয়া লাভ কী?'' তাঁহার মনের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই জ্বালাময় জগতে আর তিষ্ঠতে না পারিয়া একদিন উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিলেন। ১২৬৯ সালের পৌষমাসে আমার

পিতামহ হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে হীরালাল আঠারো বৎসর বয়েসে আত্মহত্যা করিলেন।'

শোকস্তব্ধ শিশিরকুমার তাঁর 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন'-এ লিখলেন, 'We were eight brothers and devotedly loved one another. One of our brother suddenly died and this had a tremendous effect upon the entire family. Was it for this that God implanted love in the human breast. Was it for this that He gave life. The fact was—we were trained under religious principles—and had a strong faith in the existence and goodness of our creator. Our faith in God received a rude shock when the incident happened. If god gave life and love to man and then destined man for annihilation. If He implanted love in the human breast and destined man to suffer the severe pangs of bereavement. He must be the most cruel Being in existence suerly a man—unless he were a monster—would never snatch a child from the bosom of its mother. This god was doing constantly—was god more cruel than his creation—man. If there was survival and reunion after death it was all right—otherwise what was the use of living at all. Let the entire family put an end to their lives once for all—and put an end to their misery. Thus the entire family felt in the anguish of their soul.'

প্যারীচাঁদের কাছে প্রেতচর্চার পাঠ সম্পূর্ণ করে শিশিরকুমার নিজের বাড়িতেই তাঁর অন্যান্য ভাইদের নিয়ে প্ল্যানচেটের আসর বসাতে শুরু করলেন। সঙ্গে তাঁদের মা-ও থাকতেন। মহাত্মার মেজভাই হেমন্তকুমার ও অপর এক ভাই মতিলাল মূলত এই আসরের মিডিয়াম হতেন। কখনও-সখনও মহাত্মার তৃতীয় পুত্র পয়সকান্তি ও কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসনয়নাকেও এই দায়িত্ব সামলাতে হত।

পর পর তিনদিন প্ল্যানচেটে বসে ভাই হীরালালের আত্মাকে ডেকে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন শিশিরকুমার ও তাঁর ভাইরা। চতুর্থ দিনে তাঁরা আবার প্ল্যানচেটে বসলেন। সেদিনের আসরের মিডিয়াম ছিলেন হেমন্তকুমার। বদ্ধ ঘরে তাঁরা টেবিলের সামনে বসে একাগ্র মনে হীরালালের কথাই ভাবতে শুরু করলেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর শিশিরকুমার লক্ষ করলেন হেমন্তকুমার ঠকঠক করে কাঁপছেন। তিনি বুঝতে পারলেন হেমন্তের শরীরে কোনও আত্মা ভর করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি একটা সাদা খাতা ভাইয়ের সামনে রেখে তাঁর হাতে একটা পেনসিল গুঁজে দিলেন।



THE HINDOO PATRIOT

বেশ খানিকক্ষণ নীরবতার পর হেমন্তকুমার তাঁর হাতে ধরা পেন্সিলটি দিয়ে খাতার ওপর আওয়াজ করতে শুরু করলেন।

আওয়াজ শুনেই শিশিরকুমার বুঝতে পারলেন আত্মা কথা বলতে চাইছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি হীরালালের আত্মা?

কাগজে লেখা হল—হ্যাঁ।

মহাত্মা জানতে চাইলেন,—তুমি এখন কোথায়?

কাগজে উত্তর পেলেন,—আমি এখন যেখানে আছি সেই জায়গাটা বেশ মনোরম।

—গত তিনদিন ধরে তোমাকে আনবার চেষ্টা করছি। তুমি আসছিলে না কেন?

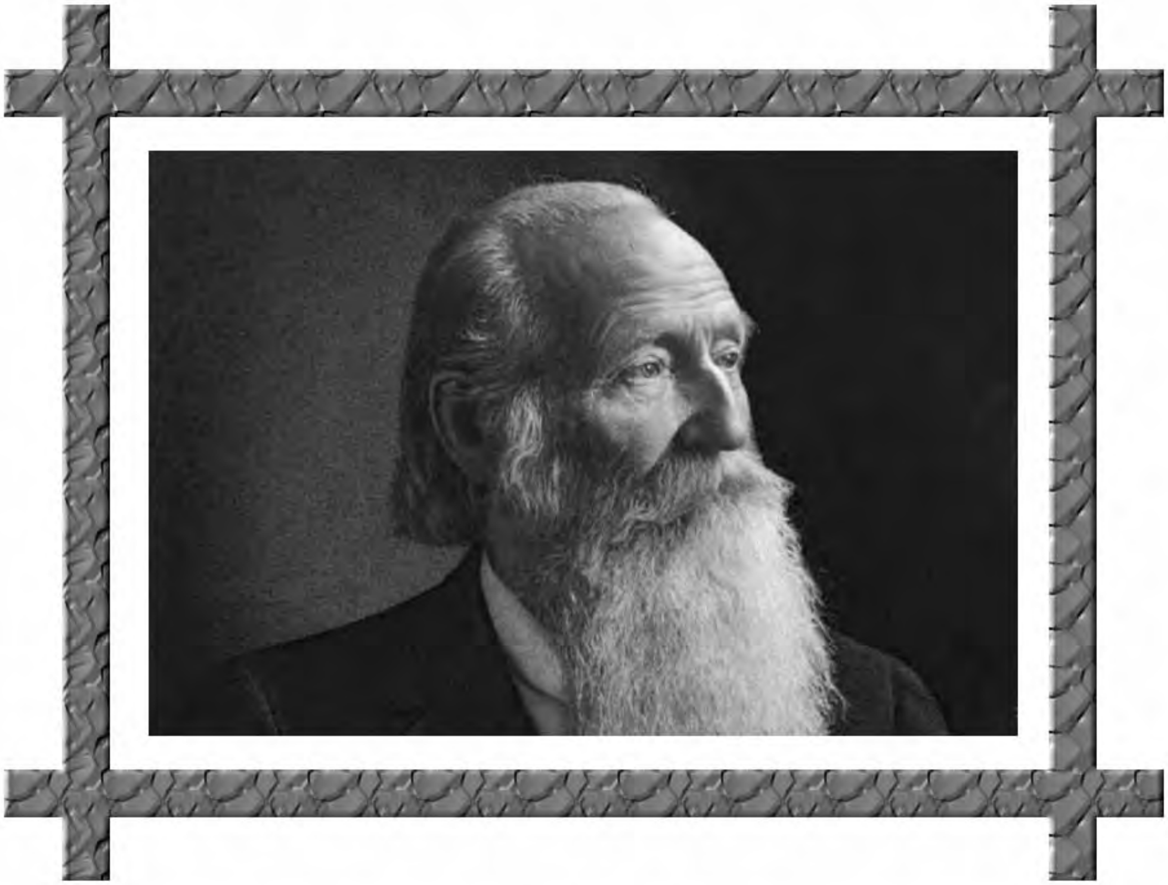
—আমাকে অনেক নিম্নশ্রেণির আত্মা তোমাদের কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিল।

—আজ কী করে এলে?

—তোমাদের ছেড়ে এসে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ তোমাদের কাছে আসব বলে সব বাধা পার করে চলে এসেছি। তোমরা ভালো থেকো। আমার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি চলি।

এই কথাগুলি লেখার পর হঠাৎই হেমন্তকুমার অস্ফুটে কেঁদে উঠলেন এবং চেয়ার থেকে পড়েও যাচ্ছিলেন। শিশিরকুমার নিজের আসন ছেড়ে কোনওরকমে উঠে ভাইয়ের পতন রোধ করলেন।

সেদিন প্রাণাধিক প্রিয় ভাইয়ের আত্মার সঙ্গে কথা বলে খুবই মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ।

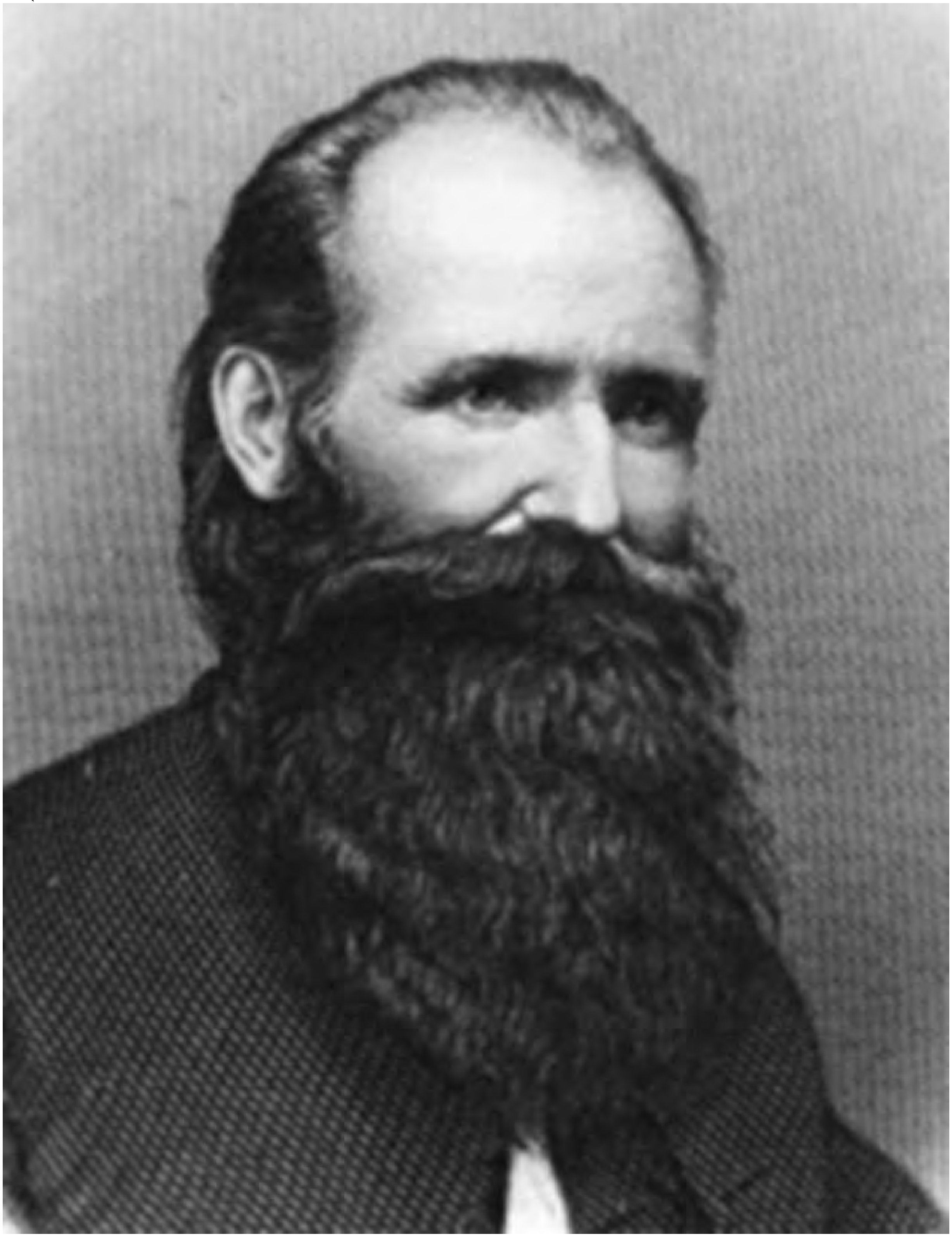


মৃত ভাইয়ের আত্মার সঙ্গে কথা বলে শিশিরকুমারের বিক্ষুব্ধ মন কিছুটা হলেও শান্ত হয়েছিল এবং এইসময় থেকেই তিনি আরও প্রবলভাবে মেতে উঠলেন প্রেতচর্চা ও ঈশ্বরের উপাসনায়। আর তখনকার পরিবেশ এবং পরিস্থিতি ছিল প্রেতচর্চার পক্ষে খুবই অনুকূল। তবে শুধু পরিবেশ ও পরিস্থিতি নয় মহাত্মা শিশিরকুমারের ভাগ্যদেবীও সেইসময় তাঁর প্রতি অতি মাত্রায় সুপ্রসন্ন ছিলেন।

শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রখ্যাত চিকিৎসক, অধ্যাত্মবিশারদ ও ন্যাশনাল স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ চার্চেস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জেমস মার্টিন পিবলস-এর পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনি মহাত্মার স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। শিশিরকুমারের এই ম্যাগাজিনের ভূয়সী প্রশংসা করে বহু চিঠিও তিনি লিখেছিলেন। তিনি যে ওই ম্যাগাজিনটি খুব মনযোগ সহকারে পড়তেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি চিঠির বিশেষ এই অংশটির ওপর নজর রাখলে। তিনি লিখছেন, 'Its contents are interesting– instructive and very valuable. I read it with a great degree of pleasure.'

দুজনের মধ্যে নিয়মিত চিঠির আদানপ্রদান থাকলেও তাঁদের তখনও মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি। আমেরিকায় অধ্যাত্মবিদ্যার প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে জেনে শিশিরকুমার সে দেশে যাবেন বলেও মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সেইসময় যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে জে এম পিবলসের সাক্ষাৎ ঘটল এই কলকাতার বুকেই। ১৯০৭ সালের ৪ জানুয়ারি স্বয়ং পিবলস কলকাতায় এলেন। তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করে উঠেছিলেন টেগোর ক্যাসেলে। কলকাতায় থাকাকালীন সাহেবের সঙ্গে শিশিরকুমারের নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হত। শুধু তাই নয়, শিশিরকুমার পাশে থাকার ফলে পিবলসের পক্ষে ভারতে প্রেতচর্চার

প্রচার ও প্রসারের কাজটি আরও সহজ হয়েছিল। খুব সম্ভবত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকাকে ডক্টরের প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।



ডক্টর পিবলস যে বছর কলকাতায় এলেন তখন শিশিরকুমারের এই সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটি কলকাতায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শিশিরকুমার তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। তিনি অত্যাচারী শাসকদের বোঝাতে পেরেছিলেন সেই চরম সত্যটি The pen is mighter than the sword। আর তার ফলে তাঁকে পড়তেও হয়েছিল রাজরোষে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। এইসময় তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ। শিশিরকুমার মুক্তি পেলেও দণ্ডিত হন চন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র।

সে কথা এখন থাক! তবে শিশিরকুমারের এই অহেতুক কৌতূহল, 'তাঁদের' জগতে অনধিকার প্রবেশে 'তাঁরা' বোধহয় মোটেই খুশি ছিলেন না। হয়তো তাই মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে অকালে ঝরে যেতে হল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পুত্র পয়সকান্তিকে।



Registred No15

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ—৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল ইং ২০ জুন ১৮৭২খৃঃ অব্দ | ১৯সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা ॥

কলিকাতা

৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার

—00—

আমরা গত সপ্তাহের পত্রিকায় সংবাদ-স্তম্ভে এক জন ভদ্র লোকের এক খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তিনি বলেন,—বাগবাজার হইতে নারি কল ডাঙ্গার পশ্চিম ও বেলিয়া ঘাটার দক্ষিণদিকে যে কাটা খাল আছে, সে খানে আম কাঁঠাল প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ করিতে গেলে টাকায় শিকি নূতন কর দিতে হইতেছে। এ করটা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি না পত্রপ্রেরক তদ্বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। আমরা এরূপ করের বিষয় কিছু মাত্র অবগত নহি। আমরা ভরসা করি, যদি এ করটি বিক্রেতারা অন্যায্য পুর্ব্বক লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করে, তবে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়রা উহা নিবারণ করিবেন।

আমরা শুনিলাম নূতন বন্দোবস্তানুসারে এক্ষণ এক এক মহকুমা এক এক জন স্কুলের ডিপুটি ইনেস্পেক্টরের অধীন রক্ষিত হইবে, তবে যদি কোন মহকুমায় অধিক বিদ্যালয় থাকে তবে যে মহকুমায় অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক বিদ্যালয় আছে, তাহার ডিপুটির

ফাটকে দিয়াছেন। লকোর্ড সাহেব আর কয়েকবার জগতকে কষ্ট দেন তিনি হাইকোর্টের আশ্রয় লইয়া নিস্তার পান। এমন স্থলে লকোর্ড সাহেব সুবিচার করিলেও আসামী কি জন সাধারণ তাহার বিচারে সন্তুষ্ট হন নাই। অতএব আমরা ভরসা করি হাই-কোর্টের জজেরা এ মোকদ্দমাটীর পুনর্বিচার করিবেন। বোধ হয় জগত মিত্র এ মোকদ্দমার আপীল করিবেন।

জীরাট গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক বিজ্ঞাপন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ স্কুলটি বাবু গোপাল চন্দ্র মজুমদারের উৎসাহে সংস্থাপিত। গোপাল বাবুর বাটি যশোহর কিন্তু তিনি কেবল দেশহিতৈষিতার নিমিত্ত এমন কি অনেক সময় নিজ হইতে ব্যয় বহন করিয়া এই স্কুলটি চালাইতেছেন। স্কুলের রিপোর্ট পাঠে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

আমরা প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার ক্যামবেল সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমরা কেন বাঙ্গালার যিনি তাহাকে চেনেন, তিনিই দুঃখিত হইবেন। কমিশনার ক্যামবেল সাহেবের

আমাদের দেশে আছেন। জেলার সভা সকল যদি এ দিকে একটু মনোযোগ দেন তবে তাঁহারা বিস্তর দৃষ্টান্ত বাহির করিয়া দিতে পারেন। নূতন ফৌজদারী আইনটি যেরূপ ভয়ানক তাহাতে আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে সকলের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। রাজসাহী সভা প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি অন্যান্য সভাও ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন।

১। বাদী গ্লাসক্ট নিলকুটিয়াল সাহেবের লোক, প্রতিবাদী গুরুদাস চৌধুরীদিগের। সমান্য মারপিট মকদ্দমা। কটন সাহেবের বিচারে বারো শত টাকা জরিমানা হয়, আপীলে জজ সাহেবের বিচারে হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার হুকুম হয় কিন্তু ঐ টাকা এক বৎসর কাল কটন সাহেব ফেরত দেন নাই। এত দ্বারায় প্রতিবাদীর কত খরচ, কত পরিশ্রম ও কত টাকা সুদ দিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

২। বাদী কুটিয়াল সাহেবের লোক, প্রতিবাদী প্রজা জামাল সদ্দার দিগর। বাদীর জমিতে অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক ধান্য বুনান করা হইয়াছে বলিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করা

পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার। প্ল্যানচেটে বসে তিনি তাঁর প্রয়াত পুত্র পয়সকান্তির সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিনা, সে তথ্য বা খবর আমাদের হাতে আজ নেই। তবে এইসময় তিনি জানতে পেরেছিলেন শিকাগো শহরের দুই বোন মৃত ব্যক্তিদের ছবি আঁকেন এবং এর জন্য তাঁদের সেই অচেনা প্রয়াত মানুষটির কোনও ছবির প্রয়োজন হয় না। শিকাগোর ব্যাঙ্কস পরিবারের এই দুই বোন

সেইসময় ওখানে 'Banks Sisters' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁদের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে শিশিরকুমার তাঁর প্রয়াত পুত্রের ছবি তাঁদের দিয়ে আঁকাবেন বলে মনস্থ করলেন।

শিকাগো শহরে শিশিরকুমারের এক পরিচিত বন্ধু থাকতেন। মহাত্মা তাঁকে চিঠি লিখে ব্যাঙ্কস বোনেদের দিয়ে তাঁর মৃত পুত্রের ছবি এঁকে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। সেই ভদ্রলোকের আবার এইসব অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি চিঠি পেয়েই তার উত্তরে লিখলেন, আমি এইসব বুজরুকিতে একদম বিশ্বাস করি না। তাই আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

বন্ধুর চিঠি পড়ে অতিশয় হতাশ হয়েছিলেন শিশিরকুমার। তবু তিনি আবার সেই বন্ধুকে কাতর মিনতি করে আরও একটি চিঠি লিখে বলেন, আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধটা রক্ষা করুন। এই ছবি আঁকতে যা খরচ হবে তা আমি অগ্রিম আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

মহাত্মার এই চিঠি পড়ে ভদ্রলোকের মনটা কিছুটা হলেও আর্দ্র হয়েছিল। তিনি লিখলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আপনার পুত্রের ছবি ব্যাঙ্কস ভগ্নীদের দিয়ে আঁকিয়ে দেব। তবে আপনার পুত্রের একটা ছবি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ছবিটা আমার কাছেই রেখে দেব। তাঁরা ছবি এঁকে দেওয়ার পর আমি সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।



পরবর্তী ডাকেই শিশিরকুমার তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র পয়সকান্তির ছবি বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই ছবির সঙ্গে তিনি একটা চিঠিও পাঠালেন। তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, আপনার কথামতো আমি ছবিটা পাঠালাম। আপনি এই ছবিটা বাইরের কাউকে দেখাবেন না। বিশেষ করে ব্যাঙ্কস ভগ্নীদ্বয়কে। তাঁদের ছবি আঁকা শেষ হলে আপনি আমার পুত্রের ছবির সঙ্গে তাঁদের আঁকা ছবিটা মিলিয়ে নেবেন। আশা করি আপনি আমার এই ছোট্ট অনুরোধটা রাখবেন।

ছবি হাতে পাওয়ার পর মহাত্মার বন্ধু তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সব কথা জানিয়ে বললেন, আগামী রবিবার তুমি কি ভাই আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কস ভগ্নীদের বাড়িতে যাবে? সেই বন্ধুও এইসব ব্যাপারগুলিকে বুজরুকি বলে মনে করতেন। তিনি বললেন, রবিবার সকালে আমি তোমার জন্য কোনও কাজ রাখব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমরা দুজনে মিলে দুই বোনের সমস্ত ভণ্ডামি, বুজরুকি ফাঁস করে দেব। তবে আমরা যে আগামী রবিবার যাব একথা তাঁদের আগে থেকে জানিও না। আমরা আচমকা তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হব।

মহাত্মার বিদেশি বন্ধু বললেন, ঠিক আছে আমরা আগাম কোনও খবর না দিয়েই আগামী রবিবার সকালে তাঁদের বাড়ি যাব। তুমি সকাল ন'টা নাগাদ আমার বাড়িতে চলে এসো। আমার বাড়ি থেকে খুব কাছেই তাঁদের বাড়ি। আমরা গল্প করতে করতে চলে যাব।

রবিবার দিন দু'জনে একসঙ্গে প্রাতঃরাশ সেরে রাস্তায় নামলেন। চমৎকার, মনোরম এক সকাল। মিনিট পনেরোর মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলেন ব্যাঙ্কস পরিবারের বাড়িতে। সেদিন অবশ্য দুই বোনের একজনই বাড়িতে ছিলেন। যিনি বাড়িতে ছিলেন তিনিই দরজা খুলে তাঁদের কাছে আসার কারণটা জানতে চাইলেন। মহাত্মার বন্ধু বললেন, আমার ভারতবর্ষের এক বন্ধুর পুত্র সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর অনুরোধেই আজ

আমরা আপনার বাড়িতে এসেছি। আমার ভারতীয় বন্ধুর খুব ইচ্ছা আপনারা দুই বোন মিলে তাঁর পুত্রের একটা ছবি এঁকে দেবেন। কারণ তাঁর কাছে সেই মৃত পুত্রের কোনও ছবি নেই।

মহিলা বললেন, আমার অপর বোন এখন বাড়িতে নেই। তাছাড়া আপনাদের আসতে আর কিছুক্ষণ দেরি হলে আমিও বিশেষ একটা কাজে বেরিয়ে যেতাম। আপনাদের উচিত ছিল একটা খবর দিয়ে আসা। তবে এসেই যখন পড়েছেন তখন আসুন আমিই ছবিটা এঁকে দেব।

মহাত্মার বন্ধু বললেন, শুনেছি আপনারা একসঙ্গে ছবি আঁকেন?

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, কথা না বাড়িয়ে আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

ভদ্রমহিলা দুই বন্ধুকে নিয়ে একটা মাঝারি মাপের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ঘরে গোটাতিনেক জানলা থাকলেও একটি বাদে সবগুলোই বন্ধ ছিল। দুই বন্ধুর দেখে মনে হয়েছিল বাকি দুটি জানলা বহুকাল খোলা হয়নি। তবে উন্মুক্ত জানলাটি দিয়ে চমৎকার রোদ খেলে বেড়াচ্ছিল ঘরের মধ্যে। আর সেই জানলার সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি ইজেল। ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটি সোফা ও ছোট্ট একটা চৌকি। তার উচ্চতা খুব একটা বেশি নয়।

দুই বন্ধুকে সেই সোফায় বসতে অনুরোধ করে মহিলা বললেন, আমি কি আমার নিজস্ব ক্যানভাসে ছবি আঁকব, না আপনারা সঙ্গে ক্যানভাস এনেছেন!

মহাত্মার বন্ধু বললেন, আমরা সঙ্গে ক্যানভাস এনেছি, আপনি আমাদের ক্যানভাসেই ছবি আঁকবেন।

সঙ্গে আনা প্যাকেট থেকে ক্যানভাসটি বের করে মহিলার হাতে দেওয়ামাত্র তিনি সেটি ইজেলে চাপিয়ে বললেন, এবার আমি কাজ শুরু করব। মিনিট কুড়ি সময় লাগবে। আমি যখন কাজ করব, তখন আপনারা সোফা ছেড়ে একদম উঠবেন না বা কোনও কথাও বলবেন না। আর আমি যাঁর ছবি আঁকতে যাচ্ছি তাঁর নামটা আপনারা কি আমাকে জানাবেন!

মহাত্মার বন্ধু বললেন, মৃত ব্যক্তির নাম পয়সকান্তি ঘোষ। পিতার নাম শিশিরকুমার ঘোষ।

ভদ্রমহিলা বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যা বললাম তা দয়া করে মাথায় রাখবেন। কথা শেষ করেই তিনি ইজেলের উল্টোদিকে রাখা ছোট চৌকিটির ওপর পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন। মিনিট দশেক এইভাবে কাটার পর মহিলা হঠাৎই অস্ফুট স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন—আমি এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি, বয়েস পঁচিশ বা ছাব্বিশ, তার বেশি নয়। এরপর তিনি অদেখা মৃত যুবকের হুবহু চেহারার বর্ণনা দিতে শুরু করলেন।

মহিলার কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন শিশিরকুমারের বন্ধু। কারণ তিনি পয়সকান্তির ছবি আগেই দেখেছেন। মহিলা যে পয়সকান্তির কথাই বলছেন তা বুঝতে তাঁর এতটুকু দেরি হল না। তিনি খুব বিস্মিত হলেও মহিলার কথামতো সোফায় চুপ করে বসে রইলেন।

বর্ণনা শেষ করেই ভদ্রমহিলা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ক্যানভাসের সামনে। খুব ক্লান্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, ওই যুবক যখন পৃথিবীতে আমাদের মাঝে ছিলেন তখনকার ছবি আঁকব, না এখন যেখানে তিনি আছেন সেই ছবি!

মহাত্মার বন্ধু কথাটা শুনে বেশ অবাক হলেন। তিনি বললেন, না, আপনি জীবিত অবস্থার ছবি আঁকুন।

ভদ্রমহিলা তাঁর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে ডানহাতটি তুলে মেলে ধরলেন ক্যানভাসের বুকে। তারপর স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

এরপরই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। হঠাৎই খোলা জানলা দিয়ে একরাশ কুয়াশা বা সাদা ধোঁয়া ঘরে প্রবেশ করে মহিলা ও ক্যানভাসটিকে প্রায় ঢেকে দিল।

এই দৃশ্য দেখে দুই বন্ধু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। বলা যেতে পারে ভয়ও পেয়েছিলেন। কোথা থেকে এত ধোঁয়া এল! কিন্তু তাঁদের জন্য আরও বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করে ছিল। যেমনভাবে হঠাৎই ঘরের মধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করেছিল ঠিক সেইভাবেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলিয়ে গেল শূন্যে। আর তারপর! সেই সাদা

ক্যানভাসের বুকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করল একটা অবয়ব। চোখ, নাক, কান, ঠোঁট। কিন্তু হঠাৎই সেই অবয়ব আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। ক্যানভাস তখন আবার শূন্য। কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার সেই অবয়ব ফিরে এল ক্যানভাসের বুকে। দৃশ্য-অদৃশ্যের খেলা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর অবশেষে ক্যানভাসের বুকে ফুটে উঠল পয়সকান্তির ছবি। এরপর ভদ্রমহিলা খুব ক্ষীণ স্বরে বলে উঠলেন, ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। আপনারা এবার এটা নিতে পারেন। দুই বন্ধু কোনওরকমে ইজেল থেকে ক্যানভাসটি মুক্ত করে নেমে এলেন রাজপথে।

তখনও তাঁদের শরীরের কাঁপুনি পুরোপুরি থামেনি।



ফেরার পথে আর হেঁটে নয়, গাড়িতে করেই বাড়ি ফিরে এলেন দুই বন্ধু। তারপর নিস্তেজ নার্ভকে সতেজ করার জন্য দু'কাপ গরম পানীয় নিয়ে তাঁরা মুখোমুখি বসলেন। তখনও তাঁদের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। তবে মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস তাঁদের দূর হয়ে গিয়েছে। তাঁরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন, ওই বাড়ির সেই ঘরে যখন ছবি আঁকা হচ্ছে তাঁরা তিনজন ছাড়াও অদৃশ্য কোনও ব্যক্তি বা শক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

নীরবতা ভাঙলেন মহাত্মা শিশিরকুমারের বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, যখন ছবি আঁকার কাজ চলছিল তখন কিন্তু আমরা তিনজন ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিলেন না। ওই ঘরে ইজেল আর ক্যানভাস বাদে আঁকার অন্য কোনও সরঞ্জামও আমাদের নজরে আসেনি। তাহলে ছবিটা কীভাবে আঁকা হল!

বন্ধু বললেন, কোনওকালেই আমার ঈশ্বর, ভূত-প্রেতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে ওই দৃশ্য দেখার পর সত্যি আমার চোখ খুলে গিয়েছে। তবে এই ছবিটা ওই ভদ্রমহিলা নন, কোনও অদৃশ্য শক্তি বা অশরীরী শিল্পী এসে এঁকেছেন। আর এই কাজে সেই অদৃশ্য শক্তি ওই মহিলাকে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

দিনদুয়েক বাদে শিশিরকুমার ঘোষের 'একদা অবিশ্বাসী' বন্ধু ক্যানভাসটি মহাত্মার ঠিকানায় পাঠালেন, সঙ্গে দিলেন একটি দীর্ঘ লেখা। নিজের চোখে দেখা সেই সকালের পুরো চিত্রটি তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বন্ধুর সেই মূল্যবান লেখাটি তিনি তাঁর 'হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিন'-এ বেশ বড় করে প্রকাশ করেছিলেন।

শিশিরকুমার ঘোষের অন্যতম একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'শ্রীঅমিয়নিমাই- চরিত'। সেই পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডটি তিনি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র পয়সকান্তিকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন—

'শ্রীমান পয়সকান্তি,

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ যে সহ্য করিতে পারিব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কী রূপে করিলাম?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ, জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন-সাধন সম্ভব ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে। তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য ছিলে। তোমার কণ্ঠে মধু-বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্তন, কি তানসেনের ভজন, যখন গাহিতে তখন পশুপক্ষী পর্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ-গুণসুধা পিয়াইতে।

সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ভজন একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল।

তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল-লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল।

যাহা কিছু এখন আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে। তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্বদা বলিতে, 'কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদয় পদ শিখিব' এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার অভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোনও বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি আমার আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়াম আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড়জগতে বোধহয় এইরূপ সূক্ষ্ম কারিগরি হইতে পারে না, অন্ততঃ কোনও কারিগর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। এই ছবিখানি সর্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালোবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু-অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাহিয়া তাঁহাকে অর্চনা করো, আর আমার যাহাতে শীঘ্র মোচন হয়, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।'

শিশিরকুমার ঘোষ, বাগবাজার

তবে এই ষষ্ঠ খণ্ডটি তিনি পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারেননি। বইটি প্রকাশের আগেই তিনি মারা যান। মহাত্মার মৃত্যুটাও ছিল বড় অদ্ভুত এবং সুন্দর। সেই মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁর 'পরলোক কথা' গ্রন্থে চিরকালের জন্য ধরে রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখছেন, 'শিশিরবাবু ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারি মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় এই মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। সে সময় অমিয়নিমাই-চরিতের ৬ষ্ঠ খণ্ড ছাপা হইতেছিল। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হইতেছিল বলিয়া, উক্ত ঘটনার কয়েকদিন

পূর্বে তিনি আমাকে বলিলেন, মৃণাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত যাহাতে আমি শেষ করিয়া যাইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত কর। তখন আমরা জানিতাম না যে তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন।

প্রকৃতই তাঁহার পরলোকগমনের তিনদিন পূর্বেও, অর্থাৎ শনিবারে, ঘোড়ার গাড়ি করিয়া তিনি ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ের শিয়ালদহস্থ বাটীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার্থে গমন করিয়াছিলেন। পরদিবস রবিবারে সর্দি লাগিয়া তাঁহার সামান্য জ্বরবোধ হয়। সোমবারে অপেক্ষাকৃত ভালো ছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে জ্বর ছিল না কাজেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি শেষ করিয়া, ভজনকীর্তনাদি ও পরে স্নানাহার করিলেন। তারপর ৬ষ্ঠ খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের শেষ ফর্মার শেষ প্রুফ সংশোধন করিলেন এবং প্রুফটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—আজ আমার এখানকার কাজ শেষ হইল। আর আমার কোনো বন্ধন রহিল না। এখন আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে ইহজীবন ত্যাগ করিতে পারিব।

এইসময় একজন চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—আজ তো আপনি ভালোই আছেন। শিশিরবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন—আমি ভালো আছি বটে, তবে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

ইহার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসনয়নাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া, সকলে আহারাদি করিতে গেলেন। শিশিরবাবু তখন ঘরের এক কোণে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং তাঁহার চির অভ্যাস মতো ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন; নিদ্রাও সামান্য হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—পরিবারস্থ সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন সকলের আহার হইয়াছে, তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে, উপবেশন অবস্থাতেই 'নিতাইগৌর' বলিয়া তর্জনী ঊর্ধ্বে উঠাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নিকটে ছিলেন। তিনি পিতার ওইরূপ ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা যাইয়া দেখি তিনি নয়ন মুদিয়া বালিশে ঠেস দিয়া যেন ঘুমাইতেছেন। অনেক সময় এইভাবে বসিয়া তিনি ঘুমাইতেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে ঠিক বেলা একটার সময় তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গেল।'



'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত এক কাহিনি। এই লেখাটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। লেখাটি শুরু করে বেশ কিছুটা এগোবার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তিনি মারা যান। সাহিত্যসম্রাট সত্যিই ভূতে বিশ্বাস করতেন কি না তা নিয়ে নানা জনে নানা কথা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। কেউ কেউ বলেওছেন যে তিনি নাতি-নাতনিদের আবদার রক্ষার জন্য বানিয়ে বানিয়ে প্রতিদিনই ভূত-প্রেত-রাক্ষস-খোক্কোসদের গল্প শোনাতেন। তাঁদের কথা পুরোটাই মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ তাঁরও 'সৌভাগ্য' হয়েছিল প্রেতদর্শনের। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তাঁর অসমাপ্ত গল্প 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'-র প্রথম পরিচ্ছদের উপর একটু চোখ রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ওই কাহিনির দুই প্রধান চরিত্র বরদা এবং সারদা। বরদা দাদা, সারদা ভাই। দুই ভাই সন্ধ্যার পর একসঙ্গে খেতে বসেছেন। হঠাৎ বরদা ছোট ভাই সারদার কাছে জানতে চাইলেন, ''সারি, সত্য করে বলো দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?

সন্ধ্যার পর টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল একটু রোস্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল।

সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরো রোস্টে উত্তম করিয়া মাস্টার্ড মাখাইয়া, বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটি রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্বণ কার্য্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, 'ভূত? না?'...

তখন বরদা বলিল, ‘Seriously’ সারি, ভূত আছে বিশ্বাস করো না?

সারি : না।
বরদা : কেন বিশ্বাস করো না?
সারদা : সেই প্রাচীন ঋষির কথা প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না আর আমি প্রমাণ অভাবে ভূত মানিব?...
বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল—বলিল, কোথাকার বাঁদর। ভূত নাই! ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই?...
সারদা : জ্যেষ্ঠকে বলিল, তুমি নাই, আর আমি নাই ইহা প্রায় philosophically true। কেন না, আমরা 'mere permanent possibilities of sensation. আর এই যে আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে, কেবল সেই possible sensation গুলার মধ্যে কতকগুলা sensation হইল মাত্র।
বরদা : সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা, এ সব possible sensation নহে?
সারদা : ভূত থাকিলে possible.
বরদা : ভূত নাই?
সারদা : তা ঠিক বলিতেছি না, তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।
বরদা : প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে?
সারদা : আমি কখনও ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।
বরদা : টেমস নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?
সারদা : না।
বরদা : টেমস নদী আছে মানো?
সারদা : যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।
বরদা : ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।
সারদা : বিশ্বাসযোগ্য এমন কে? একজনের নাম করো দেখি?
বরদা : মনে করো আমি। এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল।
সারদা : তুমি?
বরদা : তা হইলে বিশ্বাস করো।
সারদা : তুমি একটু imaginative, একটু sentimental। রজ্জুকে সর্পভ্রম হইতে পারে।
বরদা : তুমি দেখিবে?
সারদা : দেখিব না কেন?
বরদা : আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।"

এই অসমাপ্ত কাহিনির বরদা অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শেষজীবনে উপনীত হয়ে তিনি মধ্য বয়েসে কর্মোপলক্ষে কাঁথির কাছে একটি এলাকায় গিয়ে যাঁকে দর্শন করেছিলেন সেই গল্পই কি সারদার কাছে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সেই কাহিনি শেষ করার সুযোগ দেয়নি। জীবনের বুক থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

সেই রাতে জমিদারবাড়ির অতিথিশালায় সাহিত্যসম্রাট কাকে দর্শন করেছিলেন, কী ঘটেছিল সেই রাতে!

১৮৬০ সালের কথা, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস লেখার কাজে হাত দেননি। এই উপন্যাসটি প্রথম পুস্তকাকারে আমাদের হাতে আসে ১৮৬৬ সালে।

১৮৬০ সালের সেই সকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুই সহকারীকে নিয়ে কোনও এক সরকারি কাজে নিকটবর্তী শহরের উদ্দেশে রওনা হলেন। বঙ্কিমবাবু জানতেন, তাঁদের কাজ সারতে সারতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রাতে কোনওমতেই ফেরা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা সেই শহরে পৌঁছেই স্থানীয়

জমিদারমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সেই জমিদার অতি সানন্দে তাঁর অতিথিশালায় সপার্ষদ বঙ্কিমচন্দ্রের থাকার বন্দোবস্ত করলেন।

কাজ সেরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন সেই অতিথিশালায় ফিরলেন তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। তিনি ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পাশের একটি ঘরে তখন বিশ্রাম করছেন।

অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। রাত আরও গভীর হচ্ছে। কাজে মগ্ন বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎই চমকে উঠলেন। দেখলেন তাঁর ঘরে শুভ্র বসনে আবৃতা এক রমণী ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন, জমিদারবাড়ির কোনও দাসী তাঁকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে বোধহয়?

মহিলা সেই কথার কোনও উত্তর দিলেন না। বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? আমার কাছে কী চান?

এবারও কোনও উত্তর নেই। মহিলার এহেন আচরণে বঙ্কিমচন্দ্র খুব রেগে গেলেন। তিনি মহিলার দিকে কিছুটা এগোতেই সেই মূর্তি ধীরে ধীরে পিছু হটতে শুরু করল। বঙ্কিমচন্দ্র আরও খানিকটা এগিয়ে ঘরের বাইরে বেরোতেই সেই মহিলা নেমে পড়লেন প্রশস্ত উঠোনে। তারপর সাহিত্যসম্রাটের চোখের সামনে তিনি মিলিয়ে গেলেন শূন্যে।

এই দৃশ্য দেখে মোটেই ভয় পাননি বঙ্কিমচন্দ্র। নির্ভীক বঙ্কিম, বিজ্ঞানমনস্ক বঙ্কিম কেবলমাত্র স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘরে ফিরে তাঁর সহকর্মীদের ডেকে বললেন, তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আর একমুহূর্ত এই বাড়িতে থাকব না। বিস্মিত সহকর্মীরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। রাতের নির্জনতাকে কম্পিত করে তাঁদের ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলল ফিরতি পথে।



অভাব অনটন তাঁর পরিবারের নিত্য সঙ্গী তবু পিতা কালাচাঁদ মিত্র আদর করে পুত্রের নাম রাখলেন গন্ধর্বনারায়ণ। ১৮৩০ সালে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম হল বাংলার এই অন্যতম কৃতী সন্তানের। পরবর্তীকালে যাঁর সাহিত্যচ্ছটায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর কলম নিঃসৃত তীব্র স্যাটায়ারের কষাঘাতে সঠিক পথে বারেবারে ফিরে এসেছে তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। তবে সাহিত্যজগতে তিনি অবশ্য গন্ধর্বনারায়ণ নামে পরিচিত নন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গন্ধর্বনারায়ণের শৈশবটা অবশ্য তেমন সুখের ছিল না। দারিদ্র যে পরিবারের নিত্যসঙ্গী সেখানে বিদ্যাচর্চা বিলাসিতার নামান্তর। তাই গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশোনার পাঠ সাঙ্গ হওয়ামাত্রই তাঁর পিতা তাঁকে এক জমিদারের সেরেস্তায় কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। তখন গন্ধর্বনারায়ণের বয়েস মাত্র দশ।

বালক গন্ধর্বনারায়ণের এই ব্যাপারটা মোটেই মনঃপূত হল না। তাঁর মনে তখন একটাই স্বপ্ন—লেখাপড়া শিখে আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। তাই তিনি গৃহত্যাগ করবেন বলে মনস্থ করলেন। যেহেতু চাকরি করেন তাই হাতে কিছু পয়সা ছিল। সেই অল্প সঞ্চয়ের ওপর ভরসা করে তিনি পথে নামলেন, চললেন কলকাতার উদ্দেশে।

গন্ধর্বনারায়ণের কাছে কলকাতার বাসিন্দা তাঁর এক পিতৃব্যের ঠিকানা ছিল। তিনি কলকাতায় পৌঁছে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, আমি পড়াশোনা করতে চাই। আমি আপনার বাড়ির সমস্ত কাজ ও বাসন মেজে দেব, আপনি শুধু আমায় কোনও একটা স্কুলে ভর্তি করে দিন। সেই মানুষটির সাহায্যে গন্ধর্ব ভর্তি হলেন লঙসাহেবের অবৈতনিক স্কুলে। এবং এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি পরিত্যাগ করলেন গন্ধর্বনারায়ণকে, আর সেইদিন থেকে তিনি পরিচিত হলেন দীনবন্ধু মিত্র নামে। এরপর থেকে তাঁকে কখনও

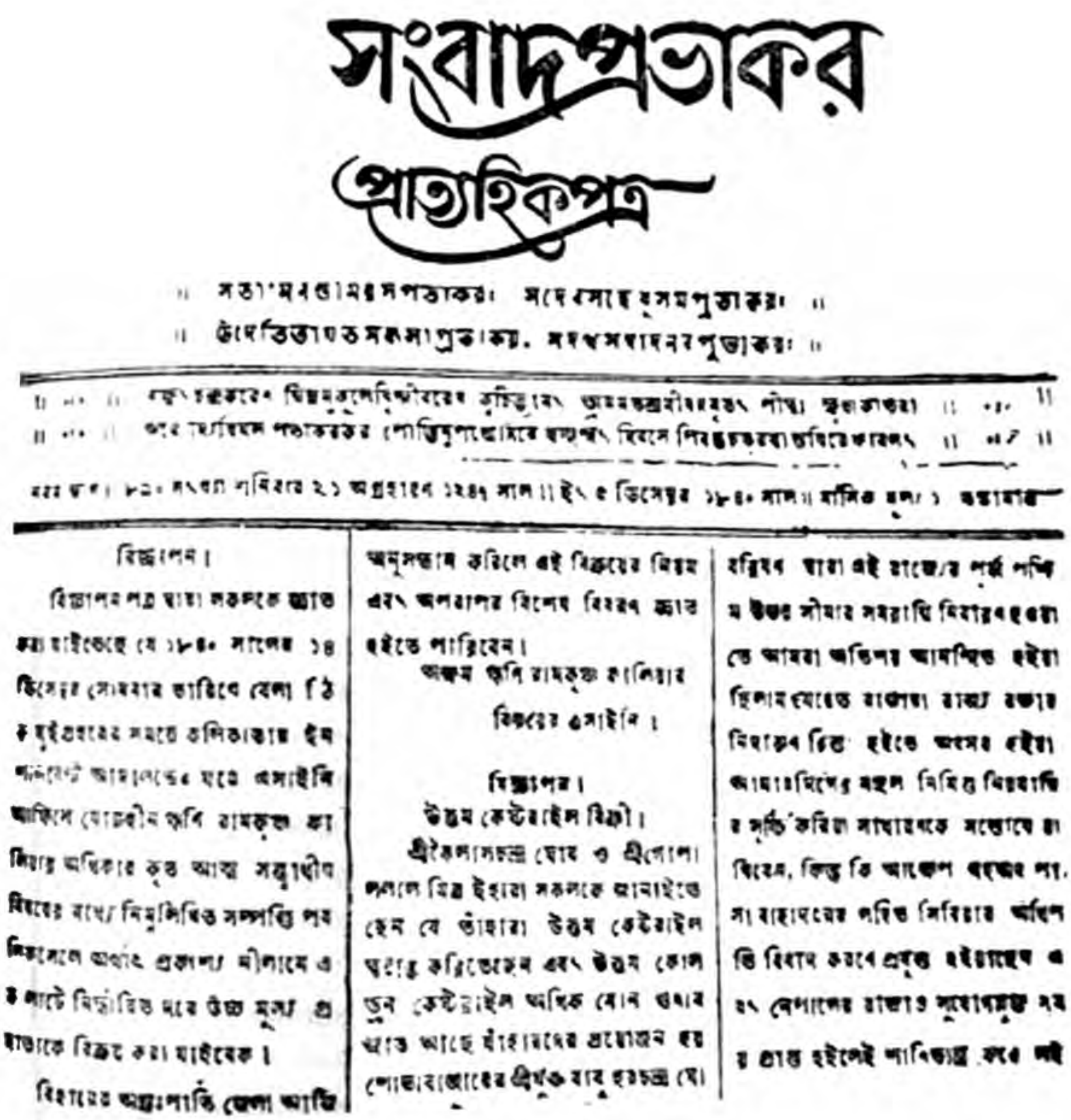
পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এই অবৈতনিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি ভর্তি হলেন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (হেয়ার স্কুলে)। ১৮৫০ সালে এখানকার শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাশ করে ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। সেখানেও পেলেন অভাবনীয় সাফল্য। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন বৃত্তি নিয়ে। অথচ কলেজের শেষ পরীক্ষায় না বসে তিনি ১৮৫৫ সালে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন পাটনায়। একশো পঞ্চাশ টাকা বেতনে তিনি যোগ দিলেন পাটনার পোস্টমাস্টারের পদে। এখানেও ভাগ্যদেবী সহায় হলেন তাঁর। অল্পদিনের মধ্যে তিনি পেলেন প্রোমোশন। দীনবন্ধু মিত্র তখন পোস্টাল ইনস্পেক্টর। লুসাই-এর যুদ্ধ তাঁর জীবনে আবার এনে দিল আর এক সম্মান। ডাক ব্যবস্থার তদারকির কাজ সুচারু রূপে পালন করার জন্য সরকারের তরফ থেকে তিনি পেলেন রায়বাহাদুর উপাধি।

হিন্দু কলেজে পড়াকালীন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের। এই মানুষটির সংস্পর্শে এসে দীনবন্ধু লিখতে শুরু করলেন কবিতা। সেইসময়েই তাঁর লেখা কবিতা তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত।

কর্মের সুবাদে দীনবন্ধু মিত্রকে প্রচুর জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে। পরবর্তী কালে নিজের লেখার চরিত্র সৃষ্টির সময় সেই স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতাকে খুব সুন্দরভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, 'দীনবন্ধু রচিত অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত।'

সেইসময় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত সমগ্র দেশ। সেই নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় অত্যাচার ব্যথিত ও মর্মাহত করত দীনবন্ধু মিত্রকে। তাঁর কলম একদিন গর্জে উঠল। সৃষ্টি হল এক অমর রচনা। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল বিখ্যাত ও তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ'। তবে সেটি দীনবন্ধু মিত্রের নামে নয়, এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কস্যচিৎ প্রথমস্য' ছদ্মনামে।

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পরে পরেই তা বহুভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাংলা কোনও নাটক যা প্রথম ইংরেজিত অনুবাদ হয়েছিল। অনুবাদ করিছেলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তবে অনেকে বলেন এই নাটকটি মধুসূদন নয়, অন্য কেউ অনুবাদ করেছিলেন। থাক সেকথা, তবে এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ ‘Nil Durpan, or The Indigo Planting Mirror’ নামে প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙ-এর বিরুদ্ধে শুরু হয় মামলা। তিনি জরিমানা ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জরিমানার টাকা আদালতেই মিটিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।


সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

বিজ্ঞাপন।

অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের নিয়ম এবং অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

উত্তম কেটরাইল বিক্রী।

প্রথম জীবনে দীনবন্ধু মিত্র ভূত-প্রেতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতেন না। এসব বাজে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু একটু বয়েস বাড়ার পরে, তখন তিনি বসবাস করেন যশোরে, সেইসময় তাঁর মনে একটা প্রশ্ন হঠাৎই উদিত হল। একজন জলজ্যান্ত মানুষ মারা গেলেন, তারপর! ছবি ছাড়া এই পৃথিবীতে তাঁর কি আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। তাহলে যে আত্মার কথা বলা হয়, যার বিনাশ নেই, সেই আত্মা কি পরজগতে বর্তমান থাকেন? এই চিন্তা তাঁকে অহরহ পীড়া দিতে শুরু করল। তখন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ যশোরেই অবস্থান করছেন। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। তখন মহাত্মা নিয়মিত প্রেতচর্চা করেন। দীনবন্ধু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শিশিরকুমার তাঁকে সাদরে তাঁদের দলে টেনে নিলেন। এই দলে তখন মহাত্মা ছাড়াও রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ খ্যাতিমান মানুষজন। আর এই প্রেতাত্মা নামিয়ে আনার খেলায় যোগ দিয়ে একবার মারাত্মক বিপদে পড়েছিলেন স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র।



দীনবন্ধু মিত্র সেইসময় কর্মসূত্রে যশোরে বসবাস করেন। তাঁর বাড়ির খুব কাছেই এক কুলীন বৃদ্ধের বাড়ি। সদ্য সেই বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী কয়েকদিনের জ্বরে ভুগে গত হয়েছেন। তাঁদের একটি আট ন'বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী রোগ শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ স্বামীর দুটি হাত ধরে অনুরোধ করে বলেছিলেন, তুমি খুকির মুখ চেয়ে আর বিয়ে করো না। তুমি যদি আবার বিয়ে করো, সৎমা এসে খুকির ওপর খুব অত্যাচার করবে। যা আমি মরেও সহ্য করতে পারব না। বৃদ্ধ মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, তুমি শান্তিতে যাও, আমি কথা দিলাম আর বিয়ে করব না। আর বিয়ে করবই বা কেন। আমি তো কুলীন ব্রাহ্মণ। তুমি আমার কততম স্ত্রী তাই তো আমার মনে নেই! অসহায়, মৃত্যুপথযাত্রিণী মহিলার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

স্ত্রী মারা গিয়েছেন প্রায় পাঁচ-ছ'বছর আগে। সংসারের হাল এখন খুকির হাতে। বৃদ্ধ পিতার সেবা-যত্ন, তামাক সেজে দেওয়া থেকে সংসারের সমস্ত কাজ সে নিজের হাতেই করে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সে লেগে পড়ে কাজে।

একদিন সকালবেলায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাকে বললেন, শোনো, আজ দু'জন অতিথি আমার বাড়িতে আসবেন। তুমি তাঁদের সামনে কখনও আসবে না। পিতার এই কথা শুনে কিশোরী কন্যার কৌতূহল প্রবল ভাবে বেড়ে গেল। অতিথিরা আসার পর সে আড়িপেতে তাঁদের কথা শুনে বুঝল, তার বৃদ্ধ পিতা আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। মেয়েটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দুপুরে বাবাকে খাইয়ে পাশের আমবাগানে গিয়ে বহুদিন বাদে মৃতা মায়ের জন্য অনেকক্ষণ কেঁদে বলল, মা, তুমি কোথায় আছ আমি জানি না। যদি আমার কথা শুনতে পাও তাহলে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

একদিন সকালে তাঁর পিতা আবার বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সৎ-মা সতীন কন্যার থেকে এক বছরের ছোট। তা সত্ত্বেও মায়ের যে-কোনও হুকুম তামিল করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে থাকত। এইভাবে কেটে গেল মাস ছয়েক। এইবার সৎ-মা তার স্বরূপ প্রকাশ করল। শুরু হল প্রবল অত্যাচার ও স্বামীর কাছে অহরহ নালিশ, এ আপদকে যত তাড়াতাড়ি পারেন বিদেয় করুন। পাত্রের বয়েস যদি বেশি হয় তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। আপনিও তো আমার থেকে কত বড়। আমার বাবা কী আপনার হাতে আমাকে সমর্পণ করতে কোনও দ্বিধা করেছেন। তাহলে আপনি কেন এতবড় মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন একে বিদেয় করুন! সৎ মায়ের কথা শুনে কিশোরী মেয়েটি কেঁপে উঠল। ছুটল তার শেষ ভরসাস্থল সেই আমবাগানে। আবার মৃতা মায়ের কাছে তাঁর সেই প্রাত্যহিক নিবেদন পেশ করল, মা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

মনমরা মেয়েটি একসময় ফিরে এল বাড়িতে। দুপুর গড়িয়ে তখন ঢলছে বিকেলের কোলে। সৎ-মা মেয়েটিকে ডেকে বলল, আমার চুলটা কে বেঁধে দেবে আজ! তোমার মরা মা!

মেয়েটি দৌঁড়ে এসে চুল আঁচড়াতে বসল।

বেশ কাজ চলছিল, মেয়েটি তখন মায়ের খোঁপা বাঁধছে। হঠাৎ প্রবলভাবে কেঁপে উঠল সেই শান্ত কন্যা। তারপর চিৎকার করে উঠে বলল, 'এবার আমি সতীন খাব, সতীন খাব'। তারপর সৎ মায়ের গলা দু'হাত দিয়ে চেপে সে গালে বসাল এক জোরদার কামড়।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল নতুন বউ। বউয়ের আর্ত চিৎকারে ছুটে এলেন বৃদ্ধ স্বামী। তিনি মেয়ের বজ্র কামড় থেকে বউকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মেয়ে মাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার তখন লাল টকটকে। সে বাপকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর বুকে চেপে বসে দু'হাত দিয়ে গলা টিপে ধরে বলল,—কী রে তোকে বারণ করেছিলাম বিয়ে করতে, কথাটা তোর সেদিন কানে ঢোকেনি তা তো বেশ বুঝতে পারছি। আমার মেয়েটাকে তোরা দুজনে মিলে অনেক কষ্ট দিয়েছিস। আর নয়। আমার কথা না শোনার শাস্তি আজ তোরা পাবি। আমি আজ তোদের দুটোকেই আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

এলাকার জোয়ান, শক্তসমর্থ যুবকরা ছুটে এল বৃদ্ধকে বাঁচাতে। তারাও মেয়েটির শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। এরপর আর কেউ মেয়েটির কাছে আসার সাহস দেখালেন না। তখন কেউ ছুটলেন ডাক্তারের কাছে, কেউ গেলেন ওঝার বাড়িতে। আর দীনবন্ধু মিত্র পুরো ব্যাপারটা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে পা বাড়ালেন মহাত্মা শিশিরকুমারের বাড়ির দিকে।

মহাত্মাকে গিয়ে তিনি সবিস্তারে সব কথা বললেন। শিশিরকুমার বললেন, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি নোটবইটা নিয়ে আসি। তারপর তিনি পুরোটাই নিজের নোট বুকে লিখে রাখলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই ঘটনাটি নিয়ে একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায়।

এই ঘটনার দিন দুয়েক বাদেই মহাত্মার বাড়িতে বিষম বিপদে পড়লেন দীনবন্ধু মিত্র। সেদিন তাঁকে মিডিয়াম করে শুরু হল প্ল্যানচেট। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর দীনবন্ধু কেমন যেন ছটফট করতে শুরু করলেন, টেবিলের ওপর ক্রমাগত পেনসিল ঠুকতে থাকলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র দীনবন্ধুবাবুর এইরূপ আচরণ দেখে হাসতে হাসতে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন!

দীনবন্ধু মিত্র ভয়ঙ্কর চোখে তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সঞ্জীবচন্দ্রকে ইশারা করে চুপ করতে বলে শিশিরকুমার জানতে চাইলেন, আপনি কে?

দীনবন্ধুবাবু সামনে রাখা সাদা কাগজে লিখলেন—কুরন সরকার। তারপর অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে তিনি কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর সকলে তাঁর কাছে কুরন সরকারের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনারা তাঁকে চিনবেন না। কুরন সরকার আমার গোমস্তা ছিলেন। বহুদিন পূর্বেই তিনি

মারা গিয়েছেন।

এই বাড়িতেই একবার এক প্ল্যানচেট সন্ধ্যায় গিরিশচন্দ্রকে মিডিয়াম করে তাঁরা এনেছিলেন কবি মিলটনকে। শোনা যায় কবি মিলটন তাঁদের অনুরোধে মিডিয়ামের মাধ্যমে কয়েক লাইনের কবিতাও লিখেছিলেন।



কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ভাগ্যদেবী কোনওদিনই এই মানুষটির প্রতি বিন্দুমাত্র সদয় ছিলেন না। চিরকালই তিনি তাঁর কৃপা-করুণা লাভে বঞ্চিত থেকেছেন। ফলস্বরূপ তাঁর পরিবার-পরিজনকে যথেষ্ট সঙ্কটের মধ্যেই দিন কাটাতে হত। অভাব-অনটন ছিল মতিলালের নিত্যসঙ্গী। যতদিন স্ত্রী ভুবনমোহিনী দেবী জীবিত ছিলেন ততদিন শ্বশুরবাড়ির অনুগ্রহে তাঁদের সংসার তরীটি কোনওমতে চলছিল। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বপ্নবিলাসী, কল্পনাপ্রবণ এই মানুষটির অবস্থা হয়ে উঠল নিদারুণ। আসলে মতিলালের কোনওদিনই কর্মের প্রতি কোনওরকম টান ছিল না। তিনি ভালোবাসতেন লেখালিখি করতে, আর সময় পেলেই ডুবে যেতেন বইয়ের জগতে। এর ফলে এলাকার মানুষজন তাঁকে মনে করত দুর্বোধ্য, মতিচ্ছন্ন, খ্যাপাটে।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর যা হওয়ার তাই হল। শ্বশুরবাড়ি থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। পাঁচ সন্তানের হাত ধরে তিনি নেমে এলেন পথে। খঞ্জরপুর এলাকায় একটি ছোট্ট খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে শুরু হল তাঁদের 'ভগ্ন সংসার'। তবে স্ত্রীর এই হঠাৎ চলে যাওয়াটা একদমই মেনে নিতে পারেননি মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। লেখা, বই পড়া, স্বপ্ন দেখা—সবকিছুই হারিয়ে গেল তাঁর জীবন থেকে। ঘর নয়, তখন তাঁর প্রিয় জগৎ হয়ে উঠল পথ। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সেই সময়কার করুণ পরিণতি সম্বন্ধে 'শরৎ-পরিচয়'-এ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যতদিন ভুবনমোহিনী বেঁচে ছিলেন ততদিন নিরাশ্রয় হননি। তাঁর মৃত্যুর পরই মতিলাল ছেলেপুলের হাত ধরে গাঙ্গুলীবাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।...ভুবনমোহিনীর অভাব তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। মতিলালের জীবনে সকল সরসতার আদিভূত কারণ ছিলেন তিনি। তারপর কতদিন দেখা গেছে, মতিলাল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ছেঁড়া চটির উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় কোমর পর্যন্ত ধূসর। মাথার

চুলগুলোয় জট বাঁধতে শুরু করেছে। পেটে নেই ভাত, হাতে নেই পয়সা। হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে কার সঙ্গে কথা কয়ে কয়লাঘাটের পথে অশ্বত্থতলায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'জিন', পূর্বপুরুষের জিন উত্তরপুরুষে প্রবাহিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র শরৎচন্দ্র পিতার থেকে পেয়েছিলেন লেখার সহজাত প্রতিভা ও যখন-তখন গৃহত্যাগ করার মানসিকতা। পরবর্তীকালে তিনি যখন প্রখ্যাত লেখক সেইসময় তিনি বন্ধুদের কাছে শৈশব, কৈশোরের নিদারুণ কষ্টের কথা বলে বলতেন, 'এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দু'বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।' আর শোনাতেন তাঁর পিতা মতিলালের ভূত দর্শনের কথা। এই গল্পটি তিনি বহুবার বহুজনকে শুনিয়েছেন।

একবার সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি ভূত মানো কি? তারপর তিনি তাঁকে শুনিয়েছিলেন কাশীতে পিতা মতিলালের ভূত দর্শনের কথা। বেশ রোমাঞ্চকর সে কাহিনি। একবার মতিলাল বেশ কয়েকদিনের জন্য কাশীতে বেড়াতে গেলেন। দিনগুলো চমৎকার কাটছে। বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণার ধাম কাশী। প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের দর্শন করে এ ঘাট-সে ঘাটে ঘুরে বেড়ান মতিলাল। একদিন কোনও এক মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের। কাশীর বাসিন্দা। কথায় কথায় তিনি বললেন, আমার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম রয়েছেন।

আমাদের পরিবারের কোনও এক পূর্বপুরুষ এই শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এতকাল আমার পিতৃদেব দেবপূজা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার ওপরেই অর্পিত হয়েছে দেবপূজার ভার। কিন্তু সম্প্রতি আমরা একটা বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছি। প্রতি রাতে আমি দেবতার পূজা সাঙ্গ করে, তাঁকে তাঁর খাটে শয়ন করিয়ে মশারি টাঙিয়ে পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বেরোনোর সময় ঠাকুর ঘরে আমিই তালাচাবি লাগাই। কারণ, বিগ্রহের অঙ্গে বেশকিছু সোনাদানা আছে।





মতিলাল এই কথাগুলি শুনে বললেন, বাঃ বেশ তো। পুজো করেন তাতে সমস্যা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন, সমস্যাটা শুরু হয় রাত এগারোটা-বারোটা নাগাদ। বন্ধ ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে তখন ভেসে আসে ঘণ্টার আওয়াজ। একদিন সাহস করে ঘরে ঢুকে দেখি, ঘর লণ্ডভণ্ড। দেবতাকে খাট থেকে নামিয়ে এনে স্থাপন করা হয়েছে তামার টাটে। সামনে আসন পাতা। কোষাকুষিতে জল, দেবতার অঙ্গে লেগে রয়েছে ফুল ও তুলসীপাতা। ঘণ্টাটিও যথাস্থানে রয়েছে। কিন্তু ঘরে কাউকে আমি দেখতে পাইনি। ঘর শূন্য। অথচ সেদিনও আমি পুজো করে বেরোনোর সময় সবকিছু যথাস্থানে রেখে এসেছিলাম।

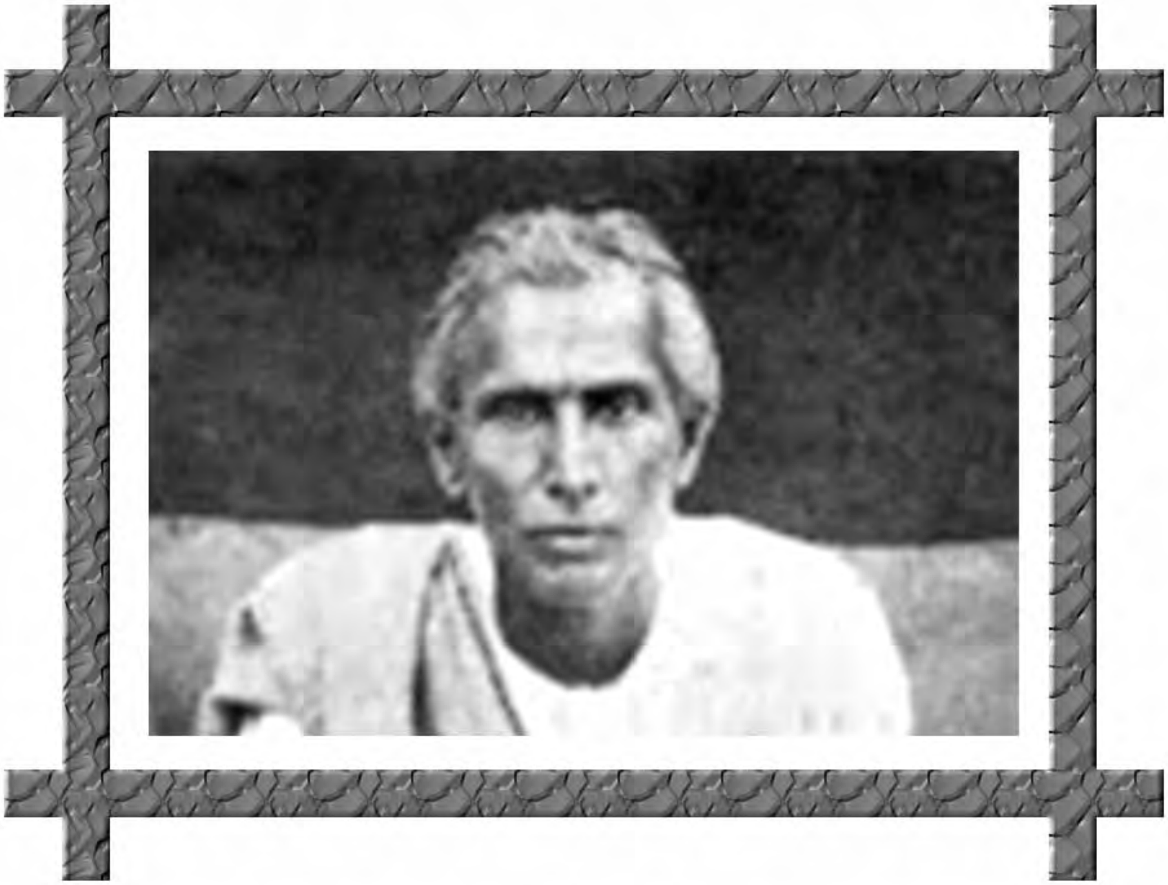
সব শুনে মতিলাল বললেন, আজ তো এখনও আপনি পুজো করেননি। আপনি অনুমতি করলে আমি আপনার পুজোর সময় ওই ঘরে থাকতে চাই।

ভদ্রলোক সানন্দে রাজি হলেন।

যথাসময়ে শুরু হল পুজো। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই তিনি পুজো করলেন। আরতির পর দেবতাকে তাঁর খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে ভদ্রলোক মতিলালকে বললেন, চলুন এবার বাইরে যাই।

মতিলাল বললেন, না, আপনি বাইরে যান। আমি এখন এই ঘরে থাকব। রাতে কী হয় তা আমাকে দেখতে হবে। আপনারা নিজেদের ঘরে চলে যান। ঘণ্টার আওয়াজ পেলে নেমে আসবেন।

ভদ্রলোক ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।



নিস্তব্ধ নির্জন ঘর, দেবতা বিশ্রাম করছেন খাটে। ঘরের এককোণে চুপ করে বসে আছেন মতিলাল। প্রদীপটা তখনও মিটমিট করে জ্বলছে। সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না। মাঝে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন মতো হয়ে পড়েছিলেন মতিলাল। সেই রেশ কাটাতে তিনি ঘরের ভেতর পায়চারি করতে শুরু করলেন। রাত যে বেশ গভীর হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। কাশী ক্রমশ শান্ত হচ্ছে। লোক চলাচল অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মতিলাল পায়চারি বন্ধ করে ফিরে এলেন নির্দিষ্ট আসনে। দুই হাঁটুর ওপর চিবুকটা স্থাপন করে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন—কী ঘটে তা দেখার জন্য!

হাতে ঘড়ি নেই, ফলে ক'টা বেজেছে তা বোঝারও কোনও উপায় নেই। হঠাৎ মতিলাল দেখলেন ঘরে তিনি আর একা নন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথা থেকে প্রবেশ করেছেন ঘরের ভিতরে এবং তিনি তাঁর দিকে দৃকপাত না করে এগিয়ে গেলেন দেবতার খাটের দিকে।

ভদ্রলোকের বয়েস সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে নামাবলি। চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা। লম্বা একটা শিখা ঝুলছে মাথার পেছন দিকে। সেটি কাঁধ স্পর্শ করেছে। ধবধবে সাদা দীর্ঘ উপবীত তাঁর কোমর ছুঁয়ে ঝুলছে।

বৃদ্ধ মানুষটি এরপর দেবতাকে তাঁর শয্যা থেকে তুলে নিয়ে এসে স্থাপন করলেন তাম্রকুণ্ডে। আসন পাতলেন, কোষাকুষি নামিয়ে এনে রাখলেন দেবতার সামনে। গঙ্গাজলের ঘটি থেকে জল ঢাললেন কোষাতে। ঘষে নিলেন চন্দন। আসনশুদ্ধি ও আচমন করে শুরু হল তাঁর পুজো। সে এক দীর্ঘ পুজো। বেশ অনেকক্ষণ বাদে একসময় বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হল আরতি। ঘণ্টার আওয়াজে ঘর তখন

মুখরিত। পুজো শেষ করে বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন দেবতাকে। তারপর বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। দেবতা কিন্তু তাঁর শয্যায় আর ফিরে গেলেন না। বৃদ্ধ তাঁকে তাম্রকুণ্ডে রেখেই অদৃশ্য হয়েছেন।

এতক্ষণে ভয়ে নিজের জায়গায় চুপ করে বসেছিলেন মতিলাল। আস্তে আস্তে তিনি দরজার সামনে এসে তালা খুলতে বললেন। ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই পরিবারের সবাই তখন ঠাকুরঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়ির গৃহকর্তা দরজা খুলে দেওয়া-মাত্রই বাইরে বেরিয়ে এলেন মতিলাল।

ভদ্রলোক মতিলালের কাছে জানতে চাইলেন, ঘরের ভেতরে আপনি কী দেখলেন? কে পুজো করছিলেন দেবতাকে।

মতিলাল বললেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেবতার পুজো করছিলেন। তারপর তিনি সেই বৃদ্ধের চেহারার বর্ণনা দিলেন।

মতিলালের মুখে ব্রাহ্মণের চেহারার বর্ণনা শুনে পরিবারের সবাই চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক বললেন, এইরকম চেহারা!

মতিলাল বললেন, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি আজ যাঁকে পুজো করতে দেখলেন তিনি আমার স্বর্গত পিতা। কিন্তু তিনি কেন রোজ পুজো করতে এত রাতে আসেন!

মতিলাল বললেন, আজ আমার সাহস হয়নি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করার। তবে ঘরে ঢুকে তিনি আমার দিকে একবারও তাকাননি। আমাদের কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছা যে তাঁর নেই তা খুব ভালোভাবেই বুঝেছি। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে আমি কাল রাতে দেব। আজ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমি যেখানে আছি সেই জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে অনেকটা। আজ রাতে আপনার বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে।

ভদ্রলোকের নির্দেশে বাড়ির একটি ঘরে মতিলালের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন ওই পরিবারের সদস্যরা। পরদিন খুব ভোরেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে মতিলাল বললেন, আজ সন্ধের সময় আবার আমি আপনাদের বাড়িতে আসব। আমি আসার পরেই আপনি পুজো শুরু করবেন।

সারাটা দিন মতিলাল ঘুরে বেড়ালেন কাশীর এ মাথা থেকে ও মাথা। গেলেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির আশ্রমে।

সন্ধ্যার সময় মণিকর্ণিকায় ডুব দিয়ে পরিষ্কার শুদ্ধ বস্ত্র পরে চলে এলেন ভদ্রলোকের বাড়িতে। মতিলালকে দেখেই তিনি বললেন, আমি এইমাত্র চা খেলাম। আপনি খেলে আমিও আর এক কাপ খেতে পারি।

গম্ভীরভাবে মতিলাল বললেন, এখন আমার চায়ের প্রয়োজন নেই। চলুন পুজোর ঘরে।

দুজনে মিলে প্রবেশ করলেন পুজোর ঘরে। যথারীতি পুজো শেষ করে ভদ্রলোক দেবতাকে শয়ন করিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই ঘরে তখন ঘুমন্ত দেবতার সঙ্গে একা রয়ে গেলেন মতিলাল।

ঠিক বারোটার সময় ঘরে আর্বিভূত হলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আজ মতিলাল যথেষ্ট সাহসী। তিনি মুখোমুখি হলেন বৃদ্ধের। বললেন, আজকের পুজোটা কি আমি করতে পারি।

বৃদ্ধ বললেন, করো, কেমন করতে পারো দেখি!

গতকাল বৃদ্ধ যেভাবে পুজো করেছিলেন ঠিক সেইভাবেই পুজো সাঙ্গ করলেন মতিলাল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন দেবতাকে।

পুজো সমাপ্ত করে মতিলাল বৃদ্ধকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বৃদ্ধ বললেন, বলো।

মতিলাল বললেন, এত কষ্ট করে রোজ রাতে আপনি কেন এই ইহলোকে ফিরে আসেন!

উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, সাধে কি আসি বাবা! তুমি আজ সারাদিন জলস্পর্শ করোনি শুদ্ধভাবে দেবতার পুজো করবে বলে। কী সুন্দর পুজো করলে! কিন্তু আমার কুলাঙ্গার পুত্রটা অনাচারী। আজকে সন্ধ্যাতেও চা খেয়ে অশুদ্ধভাবে দেবতার পুজো করল। এ আমি সইতে পারি না। আমার এক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই

দেবতাকে লাভ করেছিলেন। দেবতা আমাদের পরিবারের রক্ষক। তাঁকে অশ্রদ্ধা করছে আমার পুত্র। ও এটা কী পুজো করে? এটা ভড়ং। ওকে বলে দিও এই দেবতাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসতে। তারপর তার ফল ও হাতেনাতে পাবে। ওরা আমার বংশধর, ওদের ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। তাই রোজ রাতে আমি দেবতাকে পুজো করতে আসি। প্রথমদিকে ওরা আমার ঘণ্টার আওয়াজ পেত না। কিন্তু সকালে এই ঘরে ঢুকেও ওদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি—কেন দেবতা শয্যা ত্যাগ করে নেমে আসেন তাম্রকুণ্ডে। তারপর ঘণ্টার আওয়াজ যাতে ওরা শুনতে পায় আমি তার ব্যবস্থাও করলাম। তাতেও ওদের টনক নড়ল না।

মতিলাল বললেন, আমি আপনার পুত্রকে আপনার সব কথা জানাব।

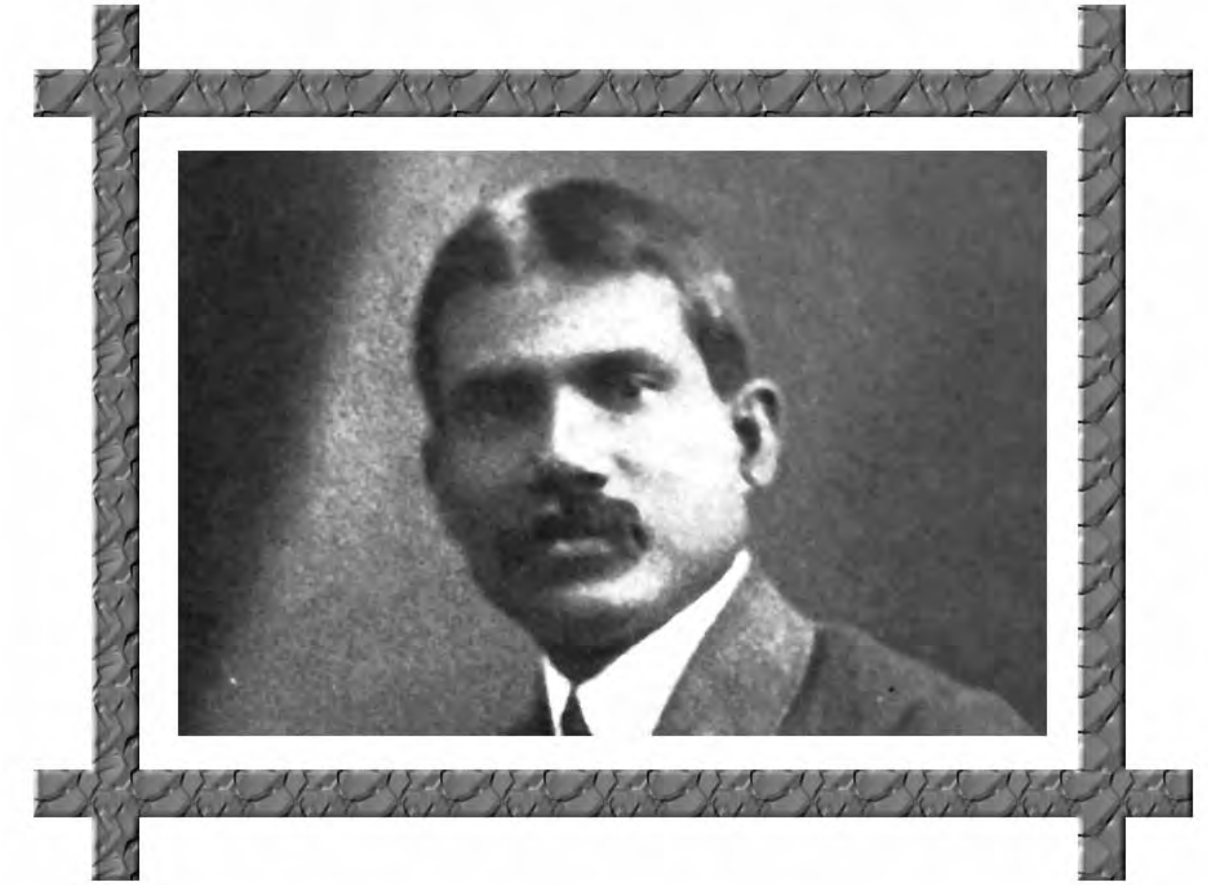
বৃদ্ধ বললেন, দেখো কথা বলে! তবে আমার এখানে আসতে সত্যি কষ্ট হয়।

মতিলাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, বৃদ্ধ বসে আছেন ভূমিতে। তিনি বললেন, বাবা দাঁড়াও, তোমার বন্ধুকে একটা ছোট্ট কথা আমার হয়ে জানিও। গয়ায় গিয়ে পিতার পিণ্ডদান করাটা কি খুব কষ্টকর! যদি সম্ভব হয় সেটা যেন করে আসে।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ঘরের বাইরে এসে ব্রাহ্মণ পুত্রকে তাঁর পিতার অনুযোগের কথা জানালেন।

পুত্র কথা দিলেন, আর হবে না এরকম। শুদ্ধভাবে দেবতার পুজো আমি করব। আর গয়ায় গিয়ে পিতার পিণ্ডও দিয়ে আসব।

তারপর থেকে রাত বারোটায় ওই বাড়ির তালা বন্ধ ঠাকুর ঘরে আর কোনওদিন ঘণ্টা বাজেনি।



গিরীন্দ্রনাথ সরকার। সাহিত্যিক হিসেবে তেমন খ্যাতি অর্জন করতে না পারলেও, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভূপর্যটক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই তাঁর ঘোরা ছিল। বহুকাল তিনি সরকারি কন্ট্রাক্টর হিসেবে ব্রহ্মদেশে কাজ করেছিলেন। আর এই সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। খুব অল্পদিনের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ শরৎবাবুর হৃদয়ে একটা পাকাপাকি আসন তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে 'শরৎদা' এবং শরৎদা তাঁর এই ভাইকে গিরীন বলে সম্বোধন করতেন। প্রথমদিকে শরৎচন্দ্রকে ভাষা সমস্যায় বারেবারে নাজেহাল হতে হয়েছে, তখন গিরীন্দ্রনাথই তাঁর দাদার দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন। এই অন্তরঙ্গতার ফলে আমরাই কিন্তু পরবর্তীকালে যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে কথাসাহিত্যিক সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আজ 'শরৎ-গবেষকরা' জানতে পারছেন। এই বইটি শুধু সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র নয়, মানবদরদি, ভূয়ষি প্রতিভার অধিকারী অসাধারণ মানুষের সুন্দর এক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। দাদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। শরৎচন্দ্রও বেশ কয়েকবার ভাই গিরীনের কালীঘাটের বাড়িতেও এসেছেন।

এই ভূপর্যটক মানুষটি একবার জোড়া বিপদে পড়লেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষময় সেইসময় পড়াশোনা করতেন দেওঘরের এক নামী স্কুলে। একদিন বিকেলে কিশোর সন্তোষময় তার স্কুলের এক বেলগাছে চড়ে বসল। কিন্তু সেখানে সে বেশিক্ষণ বসে থাকার সুযোগ পায়নি। খেয়েছিল পেল্লাই এক ধাক্কা। সোজা গাছ থেকে নেমে এল ভূমিতে। শোনা যায়, ওই বেলগাছে বসবাস করতেন এক ব্রহ্মদৈত্য। কিশোর সন্তোষময়ের বেয়াদপি তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেননি। শুধু ধাক্কা মেরেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি সেই কিশোরের শরীরের প্রবেশ করলেন। আর ঠিক সেইসময় পুরীর রাধানিবাসে ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড। গিরীন্দ্রনাথের

কন্যা কমলা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে শুরু করলেন। মানুষজন অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, অবশ্যই কমলার ওপর কোনও দৈবশক্তি ভর করেছে। গিরীন্দ্রনাথের তখন উভয়সঙ্কট। ছোটাছুটির শেষ নেই। মেয়েকে নিয়ে তিনি বহু চিকিৎসক ও কবিরাজের কাছে গেলেন, করালেন ঝাড়ফুঁক, পরালেন অসংখ্য কবচ ও মাদুলি। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হল না।

এইসময় একদল ভক্ত-প্রাণ মানুষ গিরীন্দ্রনাথকে বললেন, শুনেছি রাম-নামে ভূত পালায়। আমরা আগামী একাদশীর দিন একটা নাম সংকীর্তনের আয়োজন করব। আপনি একবার কষ্ট করে আপনার কন্যাকে নিয়ে আসবেন!

গিরীন্দ্র রাজি হলেন, বললেন, কখন আসতে হবে বলুন?

তাঁরা বললেন, সন্ধের মুখে।

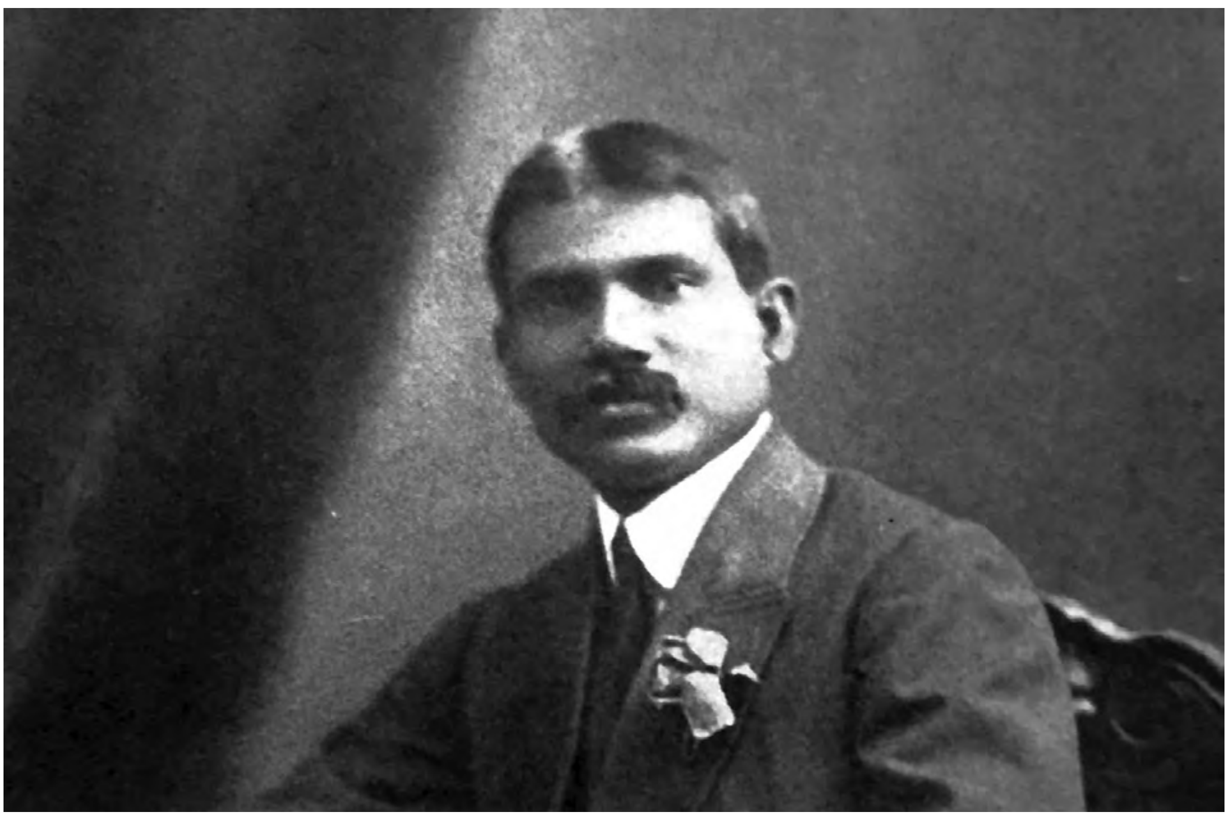
নির্দিষ্ট দিনে কন্যাকে নিয়ে তিনি সেই সংকীর্তনের আসরে এলেন। শুরু হল প্রবল নামসংকীর্তন। কমলা খুব শান্ত মনে সেই সংকীর্তন শুনছিলেন। হঠাৎ তিনিও যোগ দিলেন সেই সংকীর্তনে। আয়োজকরা কমলার মুখে রামনাম শুনে বেজায় মুষড়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝলেন এই ওষুধে কোনও কাজ হবে না। বিষণ্ণ গিরীন্দ্র এরপর মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর কলকাতার কালীঘাটের বাড়িতে।

কমলার কথা তখন কলকাতার অনেকেই জানেন। সুদূর বম্বেতেও এই খবর কোনওভাবে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে কমলাকে দেখতে এলেন বিখ্যাত পরলোকতত্ত্ববিদ ভি ডি ঋষি, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে গিরীন্দ্রনাথকে বললেন, আমি আপনার কন্যার অলৌকিক খবরটি আমার 'স্পিরিচুয়্যাল বুলেটিন'-এ প্রকাশ করতে চাই। আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, দয়া করে ওই কাজটি করবেন না, এতে আমার গৃহশান্তি নষ্ট হবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তখন কলকাতায়। লোকমুখে গিরীন্দ্রের বিপদের কথা শুনে তিনিও ছুটে গেলেন ভাইয়ের বাড়িতে।

শরৎদাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। দাদাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।





শরৎচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ গো, গিরীন এ কী শুনছি! তুমি শুধু বিলেত ফেরত নও, দুনিয়া ফেরত লোক! শেষকালে তুমিও ভূতে মজলে। কবে থেকে এসবে বিশ্বাস হল তোমার?

গিরীন্দ্র করুণ হেসে বললেন, শরৎদা, বেজায় বিপদে পড়েছি আমি। গত পাঁচ বছর ধরে এই কাণ্ড চলছে। কোনও কিছুই করতে বাকি রাখিনি। শুনেছেন তো আমার ছেলের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য ভর করেছেন। আমার ছেলেকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না।

শরৎচন্দ্র বললেন, তোমার মেয়ে কমলার খবরটা কী?

গিরীন্দ্র বললেন, ও সব অতীন্দ্রিয় শক্তির খেলা। কিন্তু, শরৎদা, তুমি জানলে কেমন করে?

কীভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন সে প্রসঙ্গে না গিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, দেখো, গিরীন, আমি যা শুনেছি, তা বিশ্বাস করা আমার কাছে সত্যিই অসম্ভব। তাই তোমার মুখে পুরো ঘটনাটা শোনার জন্য আমি ছুটে এসেছি। কমলার এই ব্যাপারটা কি শুধু পুরীর লোকজনরাই জানেন? নাকি কলকাতার লোকেরাও দেখেছেন।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, শরৎদা, কেন শুধু পুরীর লোকেরা দেখবেন? কমলার এই অলৌকিক শক্তির সাক্ষী রয়েছেন পাটনা হাইকোর্টের জজ রায়বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মন্মথনাথ বসু, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে, সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন ও বিশিষ্ট পরলোকতত্ত্ববিদ ভি ডি ঋষি এবং তাঁর স্ত্রী।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে এই খবরটা কাগজে দিচ্ছ না কেন?

গিরীন্দ্র বললেন, শরৎদা, কী হবে সাধারণের কাছে প্রকাশ করে? মিঃ ঋষিও লিখতে চাইছিলেন। আমি তাঁকে মানা করেছি।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভাইয়ের কাছে মিঃ ঋষির পরিচয় জানতে চাইলেন।

গিরীন্দ্র বললেন, মিস্টার ভি ডি ঋষি একজন প্রখ্যাত আইনজীবি। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা সন্তানপ্রসব করতে গিয়ে মারা যান। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তিনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন। এইসময় তাঁর হাতে আসে অলিভার লজের লেখা একটি বই। যেখান থেকে তিনি জানতে পারেন মৃত্যুর পরেও আত্মা বর্তমান থাকে। পরবর্তীকালে ঋষি আবার বিয়েও করেন। বর্তমানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই পরলোকতত্ত্ব নিয়ে বেজায় মেতে আছেন। শরৎদা, তাঁরা দুজনেই কিন্তু দারুণ ভালো মিডিয়াম।



ঋষি এবং তাঁর স্ত্রী খুব ভালো মিডিয়াম—এই কথাটা শুনে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কী করে জানলে তাঁরা খুব ভালো মিডিয়াম?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, আমি এবং আমার বন্ধু রায়সাহেব হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে প্ল্যানচেটে বসেছিলাম।

শরৎচন্দ্র তখনও হাসছেন, তিনি হাসি থামিয়ে জানতে চাইলেন তারপর কী হল?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, শরৎদা, আমি একসময় এসব কিছুই বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন প্রবলভাবে করি। সেদিন সন্ধ্যায় মিঃ ঋষি ইংরেজিতে সুন্দর একটি প্রার্থনা করে আমার হাতে একটি পেন্সিল ধরিয়ে বললেন, আপনার পরিচিত কোনও পবিত্র আত্মার কথা চিন্তা করুন। আমি চোখ বুজে আমার আত্মীয় সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসুর কথা ভাবতে শুরু করলাম।

মন দিয়ে ভাইয়ের কথা এতক্ষণ শুনছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি বললেন, সুভাষচন্দ্র তাহলে তোমাদের আত্মীয়?

গিরীন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, সুভাষচন্দ্রের মা আমার স্ত্রীর সম্পর্কিত খুড়তুতো বোন। জানকীবাবু আমার ভায়রাভাই হলেও তিনি আমাকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। ওড়িশায় আমরা পাঁচ বছর একসঙ্গে কত আনন্দে কাটিয়েছি।

শরৎচন্দ্র বললেন, তা বেশ! তারপর কী হল?

গিরীন্দ্র বললেন, আমি এক মনে জানকীনাথের কথা চিন্তা করতে শুরু করলাম। মিনিট দশেক এইভাবে চিন্তা করার পর আমরা যে টেবিলটার চারপাশে বসেছিলাম সেই টেবিলটার একটা পায়া শূন্যে উঠে ঠক ঠক

করে মেঝেতে ক্রমাগত আঘাত করতে শুরু করল। বুঝলাম, কেউ এসেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, কে আপনি? আপনার নাম কী?

উত্তর এল—জানকীনাথ বসু।

—এখন আপনি কোন স্তরে আছেন?

—সপ্তম স্তরে।

—কেমন লাগছে? আপনি সুখে আছেন তো?

—খুব সুন্দর স্থান। খুব সুখে আছি।

—আমি কে বলুন তো?

—গিরীন্দ্র।

শরৎচন্দ্রকে গিরীন্দ্রনাথ বললেন, দাদা, প্রথমে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য জিগ্যেস করলাম, কোথায় আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল?

উত্তর এল, ওড়িশায়।

গিরীন্দ্রনাথ এরপর বললেন, এমন দু-একটা ঘটনা আপনি কি বলতে পারবেন যা আমি আর আপনি ছাড়া এই ঘরের কেউ জানেন না!

তিনি বললেন, একবার আমার অসুখের সময় তুমি তোমার দিদিকে ওড়িশা থেকে কটকে পাঠিয়েছিলে। সঙ্গে ছিল একজন ডাক্তার, কিরণ ও তোমার ছেলে। আর একবার মন্মথবাবুর বাড়ির গীতা ক্লাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমায় কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে।

শরৎচন্দ্র মন দিয়ে গিরীনের কথা শুনছিলেন। একসময় তিনি বললেন, ভাই গিরীন, তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারটা তাঁর কাছ থেকে জানলে না কেন?

গিরীন্দ্র বললেন, জিগ্যেস করেছিলাম তাঁর কাছে, বলেছিলাম, আমার ছেলে সন্তোষময়কে মনে আছে কি?

তিনি বললেন, তোমার ছোট ছেলে তো, ওর ঘাড়ে এখন ব্রহ্মদৈত্য ভর করে আছে। তবে সে ব্যাপারে বাপু আমার কাছে কিছু জানতে চেয়ো না।

সব কথা শুনে শরৎচন্দ্র মিঃ ভি ডি ঋষির সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি গিরীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলেন, মিঃ ঋষি কি এখনও কলকাতায় আছেন?

গিরীন্দ্র বললেন, ঋষি এখন বেশ কয়েকদিন কলকাতায় থাকবেন, তারপর তিনি ঋষির কলকাতা ও বম্বের ঠিকানাটা শরৎচন্দ্রকে লিখে দিলেন।

তবে সেবার আর শরৎচন্দ্র সময় করে ঋষির সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেননি। মিঃ ঋষির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ১৯৩৭ সালের ৯ মে।

শরৎচন্দ্র তখন খুবই অসুস্থ। তবুও ঋষি কলকতায় এসেছেন শুনে তিনি দেখা করবেন বলে ঠিক করলেন। সেদিন গিরীন্দ্রনাথের বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে ঋষির বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। শরৎচন্দ্র সেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষে ঋষির সঙ্গে তাঁর আত্মা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ঠিক করেছিলেন, শরীরটা একটু ভালো হলেই তিনি এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবেন। তবে তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হয়নি। তাঁর শরীর ক্রমশ আরও খারাপ হতে শুরু করল। এই অসুস্থতার সময় শয্যাশায়ী শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'যৌবনের প্রচণ্ড তেজে এই জগতকে যে চোখে দেখেছি, এখন যাবার সময় ঠিক তার বিপরীত ভাব! ভাই, বিছানা না নিলে এ পৃথিবীটা যে কী, তা ঠিক ঠিক বোঝা যায় না।' এর ঠিক কয়েকদিন পরেই ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি পার্ক নার্সিংহোমে তিনি মারা যান।

প্রিয় শরৎদার মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলেন গিরীন্দ্রনাথ। দাদার মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই তিনি প্ল্যানচেটে বসলেন। সঙ্গে ছিলেন রায়সাহেব হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। সেদিন সন্ধ্যায় চক্রে বসে তাঁরা গভীরভাবে শরৎচন্দ্রের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। একসময় তাঁরা বুঝতে পারলেন

মিডিয়ামের উপর কোনও আত্মা ভর করেছেন। প্রথমে প্রশ্ন করলেন গিরীন্দ্রনাথ। বললেন, আপনি কে? আপনার নাম কী?

সামনে রাখা সাদা কাগজের ওপর মিডিয়াম লিখলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—শরৎদা, কেমন আছ ওখানে?

—এখানে সুখ-শান্তি অনির্বচনীয়।

—তুমি জড়দেহ কবে ত্যাগ করেছ?

—১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮।

—সেদিন কী বার ছিল?

—রবিবার।

এইবার প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, আপনি তো নিজেকে নাস্তিক বলে জাহির করতেন। এখন কী মনে হয়?

উত্তরে শরৎচন্দ্র মিডিয়ামের মাধ্যমে বললেন, এখন মতের পরিবর্তন হয়েছে। একটা জন্ম বৃথা কাটিয়েছি। এখন বুঝেছি জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ করা।

রায়সাহেব জানতে চাইলেন, আপনি প্রখ্যাত লেখক। পরলোক সম্বন্ধে একটু বলুন না!

কাগজে লেখা হল এই কয়েকটি কথা—এখানে চৈতন্যসাগরে ডুবে আছি। আকাশ-বাতাস সবই চৈতন্যময়। জড় বলে কোথাও কিছু নেই।

সেই লেখা পড়ে হঠাৎই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন শরৎ-ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ।



জোড়াবাগান থানার বিপরীতে নিমতলার বিখ্যাত মিত্র বাড়ির এই দুপুরের সময়টা বউদের বড়ই ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। এই বাড়ির প্রখ্যাত, রাশভারী শ্বশুরমশাই পুজো সেরে এখনই খেতে বসবেন। তিনি যখন খেতে বসেন, তখন সেই ঘরে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির থাকার অনুমতি নেই। তাই শ্বশুরমশাই যখন পুজোর ঘরে, তখন বউমারা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে খাবার সাজিয়ে রেখে যান।

সেদিনও বউমারা বাটিতে নানা পঞ্চব্যঞ্জন ও থালায় সুগন্ধী চালের ভাত সাজিয়ে এবং কাঁসার গ্লাসে জল ভরে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন এক জা তাঁর বড়জাকে বললেন—দিদি, এই ভাতে কি বাবার হবে? না আর একটু দেব? দেখো, ভাত যদি কম পড়ে তবুও তো বাবা আমাদের ডাকবেন না।

বড়জা বললেন, না বাপু, তুই আর একটু ভাত দিয়েই দে। বাবার খাওয়ার সময় যদিও ছোট ঠাকুরঝি ঘরের বাইরে বসে থাকে, কিন্তু তারও তো ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। আর বাবা তাকে ডেকেও তো কোনওদিন বলেননি, যা তো মা, বউমাদের একটু ভাত বা ডাল দিয়ে যেতে বল! ছোটজা হাঁড়ি থেকে থালায় আরও কিছুটা ভাত তুলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

এই দরজা বন্ধ করে শ্বশুরমশাইয়ের খাওয়ার অভ্যাসটা অবশ্য দীর্ঘদিনের নয়। স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই তিনি নতুন এই নিয়মটি চালু করেছেন এবং তাঁর এইভাবে একাকী খাওয়ার জন্য বউমারাও বেশ কষ্ট পান। তাঁদেরও তো ইচ্ছে হয় শ্বশুরমশাইয়ের সেবাযত্ন করার! কিন্তু তাঁদের শ্বশুরমশাইয়ের এক গোঁ না, আমার খাওয়ার সময় ঘরে কেউ আসবে না। বউরা তাঁদের স্বামীর কাছেও এ নিয়ে অনুযোগ করেছেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি। তাঁরাও এ ব্যাপারে স্পিকটি নট।

সেদিন তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই শোনা গেল খড়মের খট খট আওয়াজ। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এই পরিবারের অতি বিখ্যাত মানুষটি। তারপর মুখ বাড়িয়ে বাইরে বসে থাকা ভাইঝিকে বললেন, তোকে কতদিন বলেছি এখানে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকিস না। আমার কথা কেন শুনিস না বল তো!

ভাইজিও পাকা গিন্নির মতো বললে, জ্যাঠামণি, খেতে খেতে গলায় যদি ভাত আটকে তুমি বিষম খাও তখন কী হবে বলো তো! তাই তো আমি বসে থাকি।

জ্যাঠা সশব্দে হেসে খুব যত্ন করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসনে এসে বসলেন। আচমন করলেন। থালার চারপাশে দিলেন জলবেষ্টনী। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন, কই গো, তুমি কোথায়? তারপর আর কোনও কথা নয়, শুরু করলেন আহার।

সেদিন তাঁকে খেয়ে উঠেই আবার বেরোতে হবে। অন্যদিনের তুলনায় একটু দ্রুতই খাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছন দিক থেকে ভেসে এল এক নারীর কণ্ঠস্বর—এ কী, তুমি এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? শরীর খারাপ হয়ে যাবে তো।

প্রবীণ মানুষটি তাঁর ঘাড়টা ঘোরালেন পিছন দিকে। তখন সেখানে ঘটে চলেছে এক অলৌকিক কাণ্ড। আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এক সুন্দরী মহিলার অবয়ব। পরনে তাঁর লাল গরদের শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের প্রলেপ।

প্রশ্ন শুনে প্রবীণ মানুষটি বললেন, ও, তুমি এসেছ? কেন তাড়াতাড়ি খাচ্ছি জানো! আমি এখন ইউনির্ভাসিটির ফেলো হয়েছি। সেখানে আজ একটু বাদেই মিটিং আছে। সেটা সেরেই আমাকে দৌঁড়তে হবে ডিরোজিও সাহেবের বাড়িতে। সেখানে আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন, রামতনু লাহিড়ীরা আসবেন।

মহিলা বললেন, সারাটা জীবন তো দেশের ও দশের জন্য খেটে খেটে হাড় কালি করে ফেললে। এবার নিজের দিকে একটু তাকাও!

কর্তামশাই তখন হাসছেন। হাসি থামিয়ে বললেন, তোমার এই শাসনটা সত্যিই আমার খুব ভালো লাগে।

গলার স্বরটা বোধহয় ঘর পেরিয়ে বাইরে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জ্যাঠামণির নিষেধ অমান্য করেই ভাইঝি দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল লাল গরদের শাড়ি পরা একটা শরীর খুব দ্রুত বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, তুমি জ্যাঠাইমার সঙ্গে কথা বলছিলে জ্যাঠামণি। তারপরই জ্ঞান হারাল সেই কিশোরী কন্যা।

সেই দুপুরের পর তাঁদের জীবন থেকে ঝরে গিয়েছে অনেক সুন্দর দুপুর। কিন্তু আজকের দুপুরটা কেন এমন থম মেরে আছে! ভোজনরসিক কর্তামশাই খাবারের থালার সামনে কেন চুপ করে বসে আছেন? না করেছেন আচমন, না দিয়েছেন জলবেষ্টনী! এখনও তো বললেন না, কী গো তুমি কোথায়? আসলে তাঁর পরিবারের এক কনিষ্ঠ সদস্যের এখন যায় যায় অবস্থা। পরিবারের সবাই তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। ডাক্তারও আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তাই প্যারীচাঁদের মুখে আজ খাবার উঠছে না। তিনি পরিবারের অসুস্থ সদস্যটিকে নিয়ে এতটাই চিন্তিত হয়ে রয়েছেন যে, মৃতা স্ত্রী কখন পাশে এসে বসেছেন সে খেয়ালও তাঁর নেই।

মহিলা বললেন, কী গো, আজ যে একবারেই কিছু খাচ্ছ না।

—কী করে খাব বলো! তুমি নেই! যে বিপদে আমি এখন পড়েছি, তা নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করব?

—কেন আমার সঙ্গে, আমি তো তোমার পাশে সবসময় আছি।

—তুমি তো জানো আমাদের মতির ভারী অসুখ করেছে। কলকাতার কত ডাক্তার দেখালাম।

—কোনও লাভ নেই। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় এই দুপুরে, তোমার খাওয়ার সময়। আমি যে ওখানে বড় একা। তাই আমিই মতিকে নিতে এসেছি। তোমরা ওকে বাঁচাতে পারবে না। কাল মারা যাবে মতি।

খাওয়া ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি চিৎকার করে মৃতা স্ত্রী বামাকালীকে বললেন, না, তুমি ওকে কেড়ে নিও না। আমাকে দয়া করো। এই বলে তিনি মৃতা স্ত্রীর হাত দুটো ধরার জন্য যেই এগোলেন অমনি বামাকালী ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন বাতাসে।

পরদিন মারা গেলেন মতি।



স্ত্রীর মৃত্যুতে একদম অসহায় হয়ে পড়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। নিঃসঙ্গতা তাঁকে গ্রাস করছিল। পরিবার থেকে ক্রমশ তিনি দূরে সরে যাচ্ছিলেন। অবেলায় স্ত্রীকে হারিয়ে তিনি যে বিপন্নবোধ করছিলেন তা তাঁর—'ON THE SOUL ITS NATURE AND DEVELOPMENT' গ্রন্থের ভূমিকায় চোখ বোলালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি লিখছেন—'My love for God became stronger by the afflictions I met with from time to time. In the year 1860 I lost my wife- which convulsed me much, I took to the study of spiritualism which, I confess. I would not have thought of otherwise nor relished its charms. I wrote for instruction to Judge W. Edmonds in May 1861...' তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আরও লিখছেন—তাঁর সহৃদয় সেই সুপরামর্শ আমি আমার পরবর্তী গ্রন্থ 'Stray Thoughts On Spiritualism'-এ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। এই সময়েই ডাক্তার বেরিগনি কলকাতায় এসেছিলেন। সালটা ছিল ১৮৬৩ (ফরাসি ডাক্তার বেরিগনিই প্রথম কলকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও পরলোকচর্চা শুরু করেন)। সেইসময় তাঁর বাড়িতে আমরা প্রতি সপ্তাহে চক্রে বসতাম। একটি বৈঠকে আমিই হয়েছিলাম মিডিয়াম। ১৮৬০ সাল থেকেই আমি আধ্যাত্মিক লেখাপড়া ও ধ্যানধারণায় গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিলুম। এর প্রভাবে আমার চারটি বছর অতিবাহিত হয়, যার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যোগ এবং স্পিরিচুয়্যালিজম একই লক্ষ্যের অভিমুখী। সেই লক্ষ্যটি হল ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে মুক্তি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনীকার লিখছেন, 'প্যারীচাঁদ খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা বামাকালীকে বিবাহ করিয়াছেন।...পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনি প্রেততত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।'

স্ত্রী-বিয়োগের পর একদম বিধ্বস্ত প্যারীচাঁদ মিত্রের মানসিক অবসাদের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন রাজকৃষ্ণ মিত্র তাঁর 'শোকবিজয়' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'মৃত্যুর পর আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মুক্তাত্মা নিকটে থাকিয়া আপদ হইতে সর্বদা রক্ষা করেন। বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের নাম কে না শুনিয়াছেন! ইনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অতিশয় পণ্ডিত। বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে এ নগরীতে যত সাধারণ হিতার্থী কার্য্য হইয়াছে, প্যারিবাবুর হাত ছাড়া কোন কর্মই হয় নাই। দেশের ছোট বড় যাবতীয় লোক, এমনকি রাজপুরুষগণ পর্যন্ত ইঁহাকে অতিশয় সম্ভ্রম করেন। কয়েক বৎসর হইল, পরিবারের মৃত্যু হওয়ায় প্যারিবাবু শোকে অতিশয় কাতর হইয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চর্চা করিতে করিতে ১৮৬৪ সালে নিজে মিডিয়ম হইয়া উঠিলেন। এখন উঁহার স্ত্রী সর্বদা নিকটে থাকিয়া নিয়মিত পতিসেবা করেন ও আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্যারিবাবু মনে করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পান, আর এখন তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' রূপে সংসারে লিপ্ত থাকিয়া আত্মার মুক্তকাল অপেক্ষায় দিবানিশি ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া দিন যাপন করিতেছেন।'

প্যারীচাঁদ মিত্র সেইসময় কলিকাতার বেঙ্গল লাইব্রেরির (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) সম্পাদক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পরলোক চর্চা নিয়ে অতিশয় মেতে উঠলেন। লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় থাকা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করতে শুরু করলেন। আর তারই ফলস্বরূপ তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রেতচক্র ও প্রেতলোক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। লাইব্রেরির কর্ম ও অন্যান্য কাজ সেরে ঘরে ফিরেই তিনি বসে পড়তেন প্রেতচক্রে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। আর প্যারীচাঁদ মিত্র হতেন মিডিয়াম। এইসময় থেকে প্যারীচাঁদ লন্ডনের 'স্পিরিচুয়্যালিস্ট', বস্টনের প্রেততত্ত্ব বিষয়ক 'ব্যানার অফ লাইট' এবং বোম্বের 'থিওজফিস্ট' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশককে বৈপ্লবিক দশক হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারার সঙ্গে আমরা তখন পরিচিত হচ্ছি। আর এরই পাশাপাশি বাংলা মেতে উঠেছিল পরলোকচর্চা নিয়ে এবং এর প্রধান উদ্যেক্তা ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৮০ সালে কলকাতায় ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়্যালিস্ট নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন জে জি মিউগেন্স, সহ সভাপতি ও সম্পাদক রূপে মনোনীত হন যথাক্রমে প্যারীচাঁদ মিত্র ও নরেন্দ্রনাথ সেন।



তাঁদেরই আমন্ত্রণে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ নিউ ইয়র্ক থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি কর্নেল অলকট ও প্রেততত্ত্ব-বিশেষজ্ঞা মাদাম ব্ল্যাভাটস্কী কলকাতায় এসেছিলেন। প্রাসঙ্গিক না হলেও একথা জানানোর অবশ্যই প্রয়োজন আছে এই অলকট এবং ব্ল্যাভাটস্কী তাঁদের 'অলৌকিক' আসন বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। তাঁরা যে প্রতারণা করে মানুষ ঠকাতেন, তা এর কিছুদিন বাদেই জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অচিরেই তাঁরা গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। তবে এখন সেকথা থাক। তবে সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে থিওজফিক্যাল সোসাইটির যে বঙ্গীয় শাখার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারও সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ এবং তাঁদের ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পিরিচুয়্যালিস্টের অন্যান্য সভ্যরা নিয়মিত প্রেতচক্রে বসে বিভিন্ন আত্মাকে তাঁদের আসরে আহ্বান করে ডেকে এনে তাঁদের জীবনকাহিনি শুনতেন। কখনও কখনও তাঁদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনাও করতেন।



ছেড়ে যাওয়া জীবনের টানকে উপেক্ষা করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই বোধহয় পরলোকের বাসিন্দারা সর্বদাই চেষ্টা করেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র বা মিডিয়াম পান না বলেই বোধহয় তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা আমাদের কাছে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অথচ একটা সময় তখনকার বেশিরভাগ মানুষজন প্রবলভাবে প্রেতচর্চা করতেন। মৃত্যুলোক থেকে কেমন করে আত্মাদের প্রেতচক্রে আহ্বান করে নিয়ে আসতে হয় সে সম্পর্কে কলম ধরেছিলেন স্বয়ং প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি লিখছেন, 'আমাদের স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ক্যালকাটা ইউনাইটেড অফ স্পিরিচুয়্যালিস্ট) অফিস ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের ৩নং চার্চ লেনে।

প্রত্যেক রবিবার দুপুরে এই বাড়িতে এসে আমরা পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। কোনও কোনও সময় আমাদের আর একজন বিশিষ্ট সভ্য, কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার পূর্ণচন্দ্র মুখার্জির বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে, আবার কখনও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত ফরাসি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিগনির চেম্বারেও আমাদের পারলৌকিক চর্চার বৈঠক বসত।

একদিন মিউগেন্স সাহেবকে বললাম, আমি বাড়িতে মাঝে মাঝে মিডিয়াম হয়ে 'স্পিরিটের' সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব ভালো পারছি বলে মনে হচ্ছে না। মিউগেন্স সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম,—অথচ বিলেতের কাগজে পড়েছি, এফিসিয়েন্ট মিডিয়ামের সাহায্যে তারা একান্ত আপনজনের স্পিরিট নিয়ে আসছে...

—মিডিয়াম জিনিসটা কী? কারা হতে পারে মিডিয়াম? আর এক সলিসিটার নরেনবাবু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—মিডিয়াম হল, মৃত ব্যক্তির আত্মা এবং জীবিতদের ভেতরে যোগাযোগকারী—A link between the dead and the living. একটু থেমে আবার মিউগেন্স সাহেব বললেন—যাদের মনের গঠন খুব বলিষ্ঠ এবং যাদের একাগ্রতা অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন করার ক্ষমতা খুব বেশি তারাই ভালো মিডিয়াম হতে পারে—কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন। কেন যেন খুশির আমেজে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, বিলেতে আমার স্পিরিচুয়্যালিস্ট বন্ধুদের কাছে লিখেছি একজন মিডিয়ামকে পাঠাতে। কিছুদিন বাদেই এসে পড়বে।

ইংল্যান্ড থেকে মিডিয়াম আসবে জেনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হয়ে মিডিয়ামের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু...

হতাশ হতে হল। একদিন মিউগেন্স জানালেন, বিলেত থেকে মিডিয়াম আসছেন না।

দিন কাটে। আমরা একজন স্যুটেবল মিডিয়ামের খোঁজখবর করতে থাকি। বন্ধুবান্ধবদের ভেতরে একে বলি, তাকে বলি।

একদিন ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র নিয়ে এলেন এক যুবককে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। তার নাম নিত্যরঞ্জন ঘোষ। সে নাকি খুব ভালো মিডিয়াম। যে-কোনও আত্মাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারে। অশরীরী সেই আত্মা তার ওপরে ভর করে। পরলোকগত মানুষটির যা কিছু বক্তব্য ওই মিডিয়ামের মাধ্যমেই বলতে থাকে।'

তারপর কী হল! দিনটা ছিল শনিবার। সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া। প্রকৃতি কেমন যেন থম মেরে রয়েছে। সেই কোন ভোর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তবে প্রবল নয়, প্রথম বর্ষার পিটপিটে বৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই বিকেলবেলায় তিন বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র, মিউগেন্স ও মিঃ ইনিয়াস ব্রুস তাঁদের চার্চ লেনের অফিসে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রকৃতির মতো তাঁরাও যেন কেমন থম মেরে বসে আছেন।

নীরবতা ভাঙলেন প্যারীচাঁদ। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলেন মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে। তারপর মিউগেন্সকে বললেন, আর একটু বাদেই সন্ধে নামবে। এইরকম আবহাওয়া প্রেতচক্রের পক্ষে দারুণ অনুকূল। আজ যদি একজন ভালো মিডিয়াম পাওয়া যেত তাহলে খুব ভালো হত! মিউগেন্স বন্ধুর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

আর ঠিক সেইসময় প্রায় উদভ্রান্তের মতো ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র এক বলিষ্ঠ যুবকের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে প্রবেশ করলেন। ভেজা ছাতাটা দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন, প্যারীবাবু, আর কোনও চিন্তা নেই, আমরা আমাদের মিডিয়ামের খোঁজ পেয়ে গিয়েছি। এর নাম নিত্যরঞ্জন ঘোষ। খুব ভালো মিডিয়াম। আমরা আজই একে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

রাজকৃষ্ণ মিত্রের এই প্রস্তাবে তাঁর তিন বন্ধু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। সোল্লাসে তাঁরা শুরু করলেন জোগাড়যন্ত্র। নিত্যরঞ্জন বেশ গম্ভীরমুখে তাঁদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে বললেন, সেজবাতিটা আরও কমিয়ে দিন। এত আলোতে তাঁদের আসতে কষ্ট হয়।

নিত্যরঞ্জনের কথামতো ডাক্তার মিত্র আলোটা একদম কমিয়ে দিলেন। বাইরে তখন আঁধার নামছে, ঘরেও নেমে এল অন্ধকার। নিত্যরঞ্জনকে মিডিয়াম করে চার বন্ধু মাটিতে গোল হয়ে বসে পড়লেন।

প্যারীচাঁদ লিখছেন, 'ঘরের সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে আমাদের এক-একজনকে প্রেতলোকের অভিশপ্ত আত্মার মতো মনে হতে লাগল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। নিত্যর মারফত কোন প্রেত আসবে—কেমন করে আসবে—সেই ভেবে অসহ্য উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছি। আমরা লক্ষ করলাম—নিত্যর সারা শরীর যেন একটু একটু করে শক্ত হয়ে উঠছে। থর থর করে কাঁপছে সে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। আর আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে সে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর সেই বৃষ্টি মাথায় করেই পাশের বাড়ির প্রাচীরের গায়ে একটা নিমগাছে তড়াক করে উঠে পড়ল। আমাদের তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল এই কাণ্ডকারখানা দেখে। মিউগেন্স সাহেব করলেন কি—নিজেই সেই গাছে উঠে জোর করে নিত্যকে নামিয়ে নিয়ে এলেন।

সে তখন একেবারে অন্য মানুষ। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। কেমন নিস্তেজ আর অলস হয়ে বসে রইল সে। চোখ দু'টোর দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত আর কেমন সুদূর। আমাদের কাউকে যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ বিকৃত গলায় বলতে লাগল আপনারা কেন আমাকে এখানে ডেকেছেন? আমার সম্বন্ধে জানতে চান? তবে শুনুন।'



ঘরে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন নিত্যরঞ্জন ঘোষের শরীরে কোনও অতৃপ্ত, ক্রুদ্ধ আত্মা ভর করেছেন। সেজবাতির আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র বললেন, হ্যাঁ, আমরা আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাই। আপনি কে? আপনার নাম কী?

অতি কর্কশ কণ্ঠে নিত্যরঞ্জন বলে উঠলেন, আলোটা কমান। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেজবাতিটা একদম কমিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, বলুন আপনার কথা।

নিত্যরঞ্জন কর্কশ স্বরে বললেন, আমার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। আমার বাড়ি ছিল যশোরে। পাঁচ হাজার টাকার লোভে কয়েকজন দুষ্কৃতী আমাকে নৃশংসভাবে খুন করে। তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আর আমার খোওয়া যাওয়া টাকা উদ্ধারের জন্যই আমি পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পাঁচ হাজার টাকাটা খুনিরা এই চার্চ লেনের কাছেই হেয়ার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে পুঁতে রেখেছিল। তাই আমি এই অঞ্চলেই বেশি ঘোরাঘুরি করি।

পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র সেদিনের সেই সন্ধ্যার রোমহর্ষক বর্ণনা ভাবীকালের জন্য লিখে রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখছেন, 'ভোলানাথ মুখার্জির অশরীরী আত্মা নিত্যরঞ্জন ঘোষের মাধ্যমে তার জীবনকাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। আবার বলল—এখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না—এই স্তরের বেশির ভাগই আমার মতো খুন হওয়া কিম্বা গলায় দড়ি দেওয়া সব বিক্ষুব্ধ এবং অভিশপ্ত আত্মা—অন্ধকার ঘরে তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মতো শোনাল। আবার বলল, আমার স্ত্রী আমার বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছে। সে দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি তার ধর্মে-কর্মে খুব মতি ছিল। ফলে তার

আত্মা থাকে অনেক ওপরের স্তরে। সেইখান থেকে সে ক্রমাগত আমার জন্য প্রার্থনা করছে—হয়তো আমিও কিছুদিন বাদে ওপরের স্তরে তার কাছে চলে যেতে পারব। তবে সে সময় এখনও আসেনি। আমাকে আর কষ্ট দেবেন না—আমি এখন যাই। তার কথা শেষ হতে না হতে খোলা জানলা দিয়ে সাঁ-সাঁ করে একটা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ল ঘরে। আর সেই নিমগাছটা প্রবল বেগে আন্দোলিত হল। মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন ঘোষ লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।'

আর একদিনের কথা। সেদিন চক্রের বৈঠক বসেছে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে। মিডিয়াম নিত্যরঞ্জনের মাধ্যমে সেদিন যাঁর আত্মা ওই চক্রে এসেছিলেন তাঁর নাম দেবেন্দ্রনাথ তর্করত্ন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথের আত্মা মিডিয়ামের মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমার বাড়ি ছিল ব্যারাকপুরে। মাত্র ছ'বছর তিন মাস আগে আমার মৃত্যু হয়।

রাজকৃষ্ণ মিত্র এইসময় জানতে চাইলেন, আপনি এখন কোন স্তরে আছেন?

উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বললেন, আমি এখন যে দ্বিতীয় স্তর থেকে আসছি সেখানকার প্রতিটি আত্মাই পবিত্র আত্মা। সেখানে আমরা সর্বদাই সেই আনন্দময়ের কথা চিন্তা করি এবং তাঁর কথা ভেবেই আমরা মোহিত হয়ে থাকি।

এতক্ষণ চুপ করে বসে রাজকৃষ্ণ মন দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনছিলেন। তিনি এবার মুখ খুললেন। বললেন, মহাশয়, আপনি চিরকালই কি এইরকম ঈশ্বরবিশ্বাসী!

এতক্ষণে দুই চক্ষু মুদে, মাথাটা মাটির দিকে ঝুলিয়ে বসেছিলেন নিত্যরঞ্জন। ডাক্তার মিত্রের প্রশ্ন শুনে মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন মাথা তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, কৈশোর কাল থেকে দেবদ্বিজে আমার খুব ভক্তি ছিল। আমার বয়েস যখন আঠারো তখন চাকরির খোঁজে লখনৌ গিয়ে এক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলাম। তাঁর কাছেই আমি 'যোগ' শিখি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার গুরুদেব আমায় বললেন, আমার যা ছিল সব কিছু আমি তোমাকে উজাড় করে দিয়েছি। এর বাইরে আমি আর তোমায় কিছুই দিতে পারব না। তবে তোমার আরও অনেক কিছু জানা ও শেখার বাকি আছে। তার জন্য তোমার উপযুক্ত গুরুর প্রয়োজন। এবার তুমি সেই গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। তারপরই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গুরুদেবের আদেশে আমি আবার পথে নামলাম। চলে গেলাম বিন্ধ্যগিরিতে। সেখানে আমাকে কৃপা করলেন তিনজন সিদ্ধ যোগী। বেশ আনন্দেই কাটছিল তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু এখানেই আমি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কিছুদিন রোগভোগের পর বুঝতে পারলাম এবার আর সুস্থ হওয়ার আশা নেই। তারপর আমার জীবনে এল সেই অদ্ভুত সকালটি। আমার লখনৌয়ের গুরুদেবের আবার দর্শন পেলাম। তিনি আমার রোগশয্যার পাশে বসে আমার ডান হাতখানি সস্নেহে ধরে বললেন, ভয় নেই, আমি এসে গিয়েছি, তোমাকে আজ এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে লোভ নেই, পাপ নেই। সত্যিই মৃত্যুর পরে এমন জায়গায় এলাম যেখানে পৃথিবীর মতো দিন নেই, রাত নেই। কিন্তু এমন একটা অপরূপ আলোয় চারিদিক ভরে থাকে যাতে মনে হয় যেন এখানে বুঝি অহরহ গোধূলি বিরাজ করছে। আপনাদেরও একদিন সেখানে আসতেই হবে। তবে আজ আর আপনাদের মিডিয়াম আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না। এবার আমি যাব। কথা শেষ করেই মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন নির্জীবের মতো বসে রইলেন।

কর্মজীবনে বহু সরকারি সংস্থার উচ্চপদে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটত। তবু তিনি নিয়মিত পরলোকচর্চা করতেন। বলা যেতে পারে, তিনি ওই জগৎটাকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২৯.১২.১৮৮১ সালের 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ চোখ রাখলে। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখছেন, 'আমার স্ত্রীর পরলোকগমনের পর হইতে আমি আধ্যাত্মিকচর্চা করিয়া আসিতেছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অমৃতলাল আমাদের পারিবারিক চক্রে বসিয়া পরলোকগত নিজ জনদিগের আত্মার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। একদিন মিঃ এগলিন্টন আমাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে চক্রে বসিয়াছিলেন।'

তবে প্যারীচাঁদের প্রয়াণের পর মিত্রবাড়ির প্রেতচর্চা চালু ছিল কি না সে খবর আমরা কেউ-ই জানি না!



শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বাজার সরকার। মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর কেমন লতায়-পাতায় আত্মীয়তা ছিল বলেও শোনা যায়। সামাজিক প্রতিপত্তি ও বংশ কৌলিন্যে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার ঠাকুর পরিবারের সমকক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছায় শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হল মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

কাদম্বরী দেবীর বয়েস তখন নয়, এবং সুদর্শন ও নানাবিধ গুণসম্পন্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইসময় সদ্য উনিশের যুবক। বউ হয়ে ঠাকুর পরিবারে জীবন শুরু করলেন কাদম্বরী দেবী। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র সাতবছরের শিশু। তিনি খেলার সাথী হিসেবে কাছে পেলেন তাঁর নতুনদাদার স্ত্রী নতুন বৌঠানকে। দুই বালক-বালিকার মধ্যে সেদিন যে সুন্দর, পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বজায় ছিল আজীবন। তাই নতুন বৌঠানের অকালমৃত্যুকে একদম মেনে নিতে পারেননি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন লেখা ও কবিতায় সেই 'বিষাদ' বারে বারে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্ল্যানচেটের আসরে বহুবার এসেছেন নতুন বৌঠান। তবে কোনওবারই রহস্যময়ী কাদম্বরী দেবী নিজ নাম নিজ মুখে প্রকাশ করেননি। তাঁর উপস্থিতি একমাত্র বুঝেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ঠাকুর পরিবারের এই বিবাহের খবর ১৮৭০ সালের শ্রাবণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছিল—'গত ২৩ আষাঢ়, ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চমপুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া

গিয়াছে। বিবাহসভায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর তক্ষ্যভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।'

মহর্ষির ইচ্ছায় সম্পন্ন হওয়া এই অসম বিবাহকে কেন্দ্র করে শোনা যায় ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলে তীব্র বিদ্রোহের ঝড় উঠেছিল। মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র বিলেত ফেরত আইসিএস অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী এই বিয়ে কোনওদিনই মেনে নেননি। জ্ঞানদানন্দিনী নাকি এ-কথাও বলেছিলেন— বাবামহাশয়ের অন্যায় জেদের কারণেই এই বিয়েটা হল। নতুন মেনে নিল, কোনও প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। কিন্তু এই বিয়েতে কারও মঙ্গল হবে না! নতুনের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় নতুন আর কোথায় ওর বউ!

এই বিয়েতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে খুব অখুশি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি পড়লে তা একবারও মনে হয় না। তিনি লিখছেন, 'দিনের শেষে ছাদের উপর

পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটিতে ছাঁচি পান। বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্যডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু-হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার সবথেকে বড় সমালোচক ছিলেন তাঁর বউঠাকরুন। তিনি কবিকে লেখক বলে পাত্তাই দিতেন না। বলতেন, তুমি কোনওকালেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারবে না। এটা নিয়ে বড়ই আক্ষেপ ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি লিখছেন, 'বউঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উলটো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মনমরা হয়ে ভাবতুম তার চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তাহলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধ সাধত।'

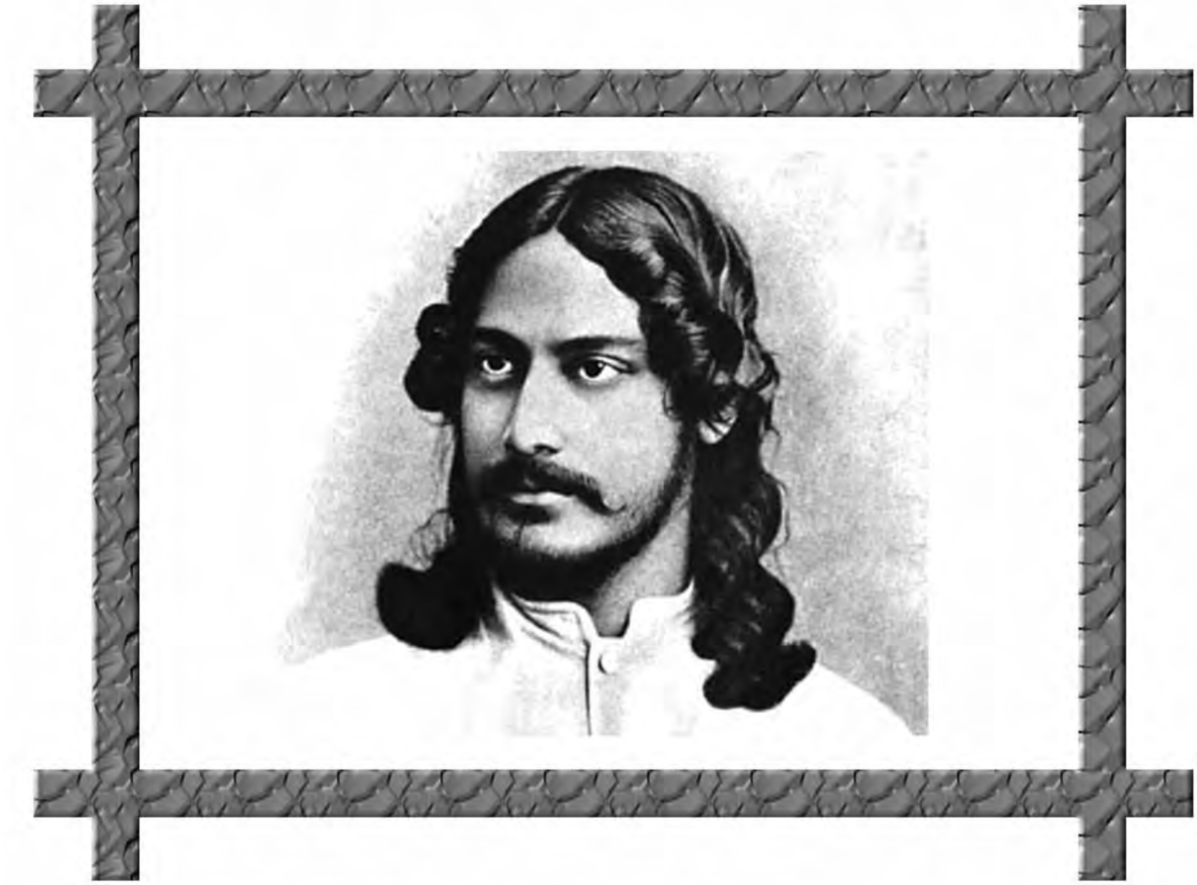
সুখ ক্ষণিকের, সুখ হয় না দীর্ঘস্থায়ী! তাই সময় একদিন কাল থেকে কালান্তরে উড়িয়ে নিয়ে গেল দেওর-বউদির জীবনের সেই সুন্দর, মধুর মুহূর্তগুলিকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর নিজের জগতে। পরিবারের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ গেলেন বিদেশে। নিঃসঙ্গ কাদম্বরী দেবী বোধহয় তখন থেকেই তলিয়ে যেতে শুরু করলেন অবসাদের চোরাবালিতে।

এরপরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে আসবেন মৃণালিনী দেবী, তাঁর অত্যন্ত আদরের ছোটবউ। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃণালিনী দেবী বউ হয়ে এলেন ঠাকুর পরিবারে। আর তার ঠিক সাড়ে চারমাসের মাথায়, ১৮৮৪ সালের ২১ এপ্রিল জীবন থেকে ঝরে গেলেন কাদম্বরী দেবী। তবে তিনি এর আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সেবার অবশ্য তিনি মৃত্যুর অতুলনীয় স্পর্শ পাননি, পেলেন পঁচিশ বছর বয়েসে।

এই অপঘাত মৃত্যু ও কাদম্বরী দেবী প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক সময় কলম ধরেছিলেন। তিনি লিখলেন, 'এই অসামান্যা নারী ছিলেন যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেন্টিমেন্টাল এবং আরো বলিব ইনট্রোভার্ট, সিজোফ্রেনিক। অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। পত্নীর প্রতি মনযোগী থাকিলে তাঁহার নিঃসন্তান জীবনের সঙ্গীহীন শূন্যতা কিছুটা পূরণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে উদাসীনতাই দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যকার ও অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চের নটনটীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া অপবাদ শোনা যায়। জানি না, এইরূপ কোনো সন্দেহের বশবর্তী হইয়া এই অভিমানিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা?'

১৯ এপ্রিল শ্যামা নামের কোনও মহিলার থেকে আফিম সংগ্রহ করে কাদম্বরী দেবী চললেন চিরঘুমের দেশে। তারপর দুদিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি অবশেষে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। কিন্তু এই

মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন দুজন মানুষ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেদিন মৃতা স্ত্রীকে দেখতে পর্যন্ত যাননি। নিজের ঘরে নিজেকে বন্দি করে রেখেছিলেন। নিজের স্ত্রীর মুখাগ্নি করতেও অস্বীকার করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ! তিনি আমৃত্যু পরম মমতায় নিজের হৃদয়ে লালন করেছিলেন তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে।



অপমৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটা মতামত ছিল। পরিণত বয়েসে তিনি এ সম্পর্কে তাঁর মতামত মংপুতে থাকাকালীন মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অপমৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথা কী মনে হয় জানো, হঠাৎ যে বন্ধন ছিন্ন হয়, হয়তো তা সুসমঞ্জসভাবে ছিন্ন হয় না। যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তাহলে তার পুরোনো বন্ধন মুক্ত হয়ে নতুন অস্তিত্বে প্রবেশ করবার জন্য হয়তো একটা পথ পার হবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, সে ছেদ হয়তো ভালোভাবে হয় না। এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবেশ তাই বিলম্বিত অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। জানিনে অবশ্য এসব কী হতে পারে বা না পারে, সমস্তই অনিশ্চিত, তবে মনে হয় অপমৃত্যু অস্বাভাবিক বলেই তার মধ্যে একটা যন্ত্রণা থাকা সম্ভব, তার যে ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল না। সে জন্যে আরো একটা কথা মনে হয়, যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে তখন আসক্ত হয়ে শোকাকুল হয়ে তাকে বদ্ধ করাবার চেষ্টা উচিত নয়—আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে, যখন দেখেছি কোনো আশাই নেই, তখন আমি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র করে মনে করেছি—তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি তোমার নির্দিষ্ট পথে। নিজের সন্তানকেও আঁকড়ে রাখতে চাইনি। যেতে যখন হবেই, তখন যেন আমার আসক্তি, আমার বেদনা, তাকে মর্ত্যের সঙ্গে বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে যেন কষ্ট পেতে না হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল, যেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করাই উচিত। ঘটনাপ্রবাহ আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি তো আমার হাতে আছি।'

অসংখ্য প্রিয়জনের মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন আমাদের প্রাণের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই বোধহয় ঠাকুর বাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য প্ল্যানচেটের প্রতি তাঁর মন একসময় আকর্ষিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির

একটি প্রিয় বিষয় ছিল প্ল্যানচেট। তার প্রথম উল্লেখ আমরা পাই 'জীবনস্মৃতি'-তে। ঠাকুরবাড়ির জনৈক খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জেকে যখন প্ল্যানচেটে আনা হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। মুখুজ্জেমশাই ইহলোকে রসিক ব্যক্তি ছিলেন। পরলোকে গিয়েও সেই রসিকতা তিনি বিস্মৃত হননি। প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁকে যখন ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় পরলোক জায়গাটি কেমন, তিনি উত্তর দেন, মরে গিয়ে অতি কষ্টে যা তিনি জেনেছেন, প্রশ্নকর্তারা না মরে তা জেনে নেবেন সেটি হবে না।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্ল্যানচেট-কাহিনির উল্লেখ পাই তাঁরই একখানি চিঠি থেকে। একবার প্রমথনাথ বিশী চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা জানতে চান। কারণ একসময় মাইকেল নিয়মিত না হলেও প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে আসতেন। সেইসময়কার কোনও স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে আছে কি না সেটাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে মাইকেলের গতিবিধির পরে আমার জন্ম। আমি তাঁকে দেখিনি। একবার প্রেতবাণীবহ চক্রযানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা সাক্ষ্যরূপে আদালতে গ্রাহ্য হবে না।'

অমিতাভ চৌধুরী লিখছেন, '১৯২৯ সালের পর রবীন্দ্রনাথের পারলৌকিক চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সেই বছরই তিনি জানতে পারেন, তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু শান্তিনিকেতনের একদা-অধ্যাপক 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-র লেখক মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দেবীর (বুলা) মিডিয়াম হবার যোগ্যতা আছে। তখন থেকে পরলোক সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল শুধু বাড়েনি, পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বাসনাও বেড়েছে। ঠাকুরবাড়ির ধারা অনুযায়ী, আগে যে সব পরলোকচর্চা করেছেন সবই প্ল্যানচেট মারফত। ১৯২৯ সালেই সর্বপ্রথম মিডিয়ামের সাহায্য নিলেন। প্রথমে অবশ্য তিনি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ ছিলেন।

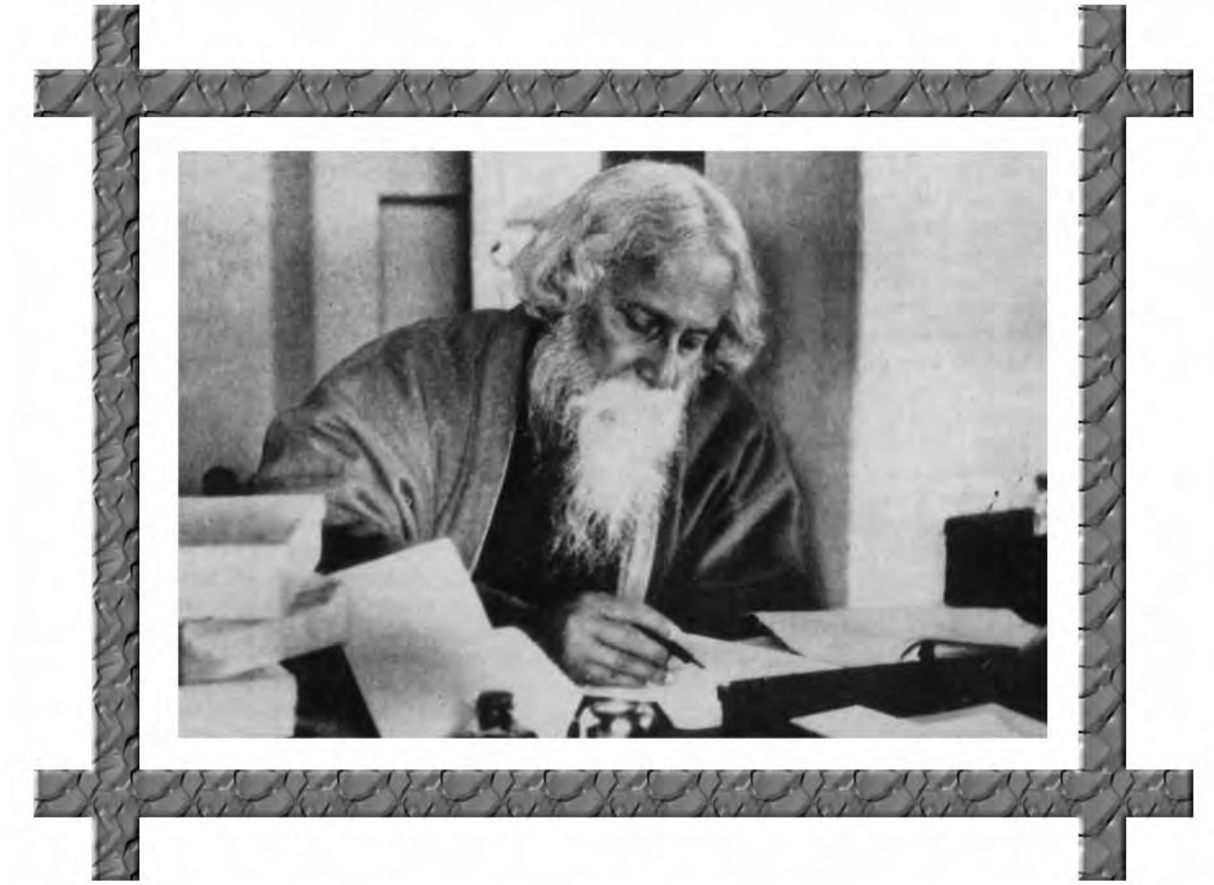
উমা দেবী বা বুলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তিনি রানি মহলানবিশকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সেদিন বুলা এসেছিল। হঠাৎ কথায় কথায় প্রকাশ পেল তার হাতে প্রেতাত্মা ভর করে পেনসিল চালিয়ে কথা কইতে পারে। বলাবাহুল্য শুনে মনে মনে হাসলুম। বললুম— আচ্ছা দেখা যাক। প্রথমে নাম বেরোল মণিলাল গাঙ্গুলি। তার কথাগুলোর ভাষা এবং ভঙ্গির বিশেষত্ব আছে। উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সেই কথা কইছে।'

কিন্তু কে ছিলেন এই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়! ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর কি কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল? তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। তাঁরই পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরবড়িতেই থাকতেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বহু ছোট গল্প লিখেছেন। বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জীবিতকালে মণিলালের বাতিক ছিল প্রেতচর্চা। তিনি মারা যান ১৯২৯ সালে। মনে হয় মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই তিনি এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার আসরে।

তবে কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন বুলা সত্যিই উচ্চমানের মিডিয়াম। এরপর থেকে বুলার এই অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতি কবির সত্যই বিশ্বাস জন্মেছিল। এইপ্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'বাল্যকাল ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে এতকাল পরে পরিচিতা কন্যার মিডিয়ামে অতিপ্রাকৃত রহস্যলোকে প্রবেশের ইচ্ছা হইল। বুলার অসামান্যতার কথা কবির মুখে শুনিয়াছি। অতি জটিল প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে তাহার কম্পমান হস্ত হইতে উত্তর লেখা হইয়া যাইত। প্রশ্নের উত্তর দেখিয়া কবি স্তম্ভিত।'

পরলোকচর্চার আসরে মিডিয়ামের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যেসব আত্মাকে আগ্রহ করে ডেকেছেন তাঁদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কবিগুরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা), কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী সাহানা দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়

সহ আরও অনেকে। শুধু তাই নয় তাঁর সেই আসরে রবীন্দ্রনাথ না ডাকলেও চলে আসতেন অনেকে। এবং সেই তালিকাটা মোটেই ছোট নয়।



বাল্য বন্ধু, খেলার সাথী নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে কবি সত্যিই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। বুক-ভরা অভিমান নিয়ে বৌঠানের এইভাবে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন ছিল। কত স্মৃতি, কত কবিতা পাঠ, কত গান, কত খুনসুটি—স্মৃতির ঝাঁপি খুলে সেইসব রঙিন দিনগুলি পাখা মেলে যেন উড়ে বেড়াত রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে। তবে তিনি ছিলেন প্রকৃতিতে কঠোর। নিজের মনকে বশে রাখার কায়দাটা তিনি বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে কোনও মৃত্যুতেই তিনি প্রবলভাবে ভেঙে পড়েননি। বরঞ্চ শান্ত মনে তিনি তাঁর পরম প্রিয়জনদের বিদায় জানিয়েছেন।

একটু ফিরে যাই সেই দিনটিতে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের (ইংরেজির ১৮৮৩) ২৪ অগ্রহায়ণ। এইদিনেই কবি হাত ধরেছিলেন ভবতারিণী দেবীর। নিজের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অভিনব নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন তাঁর বন্ধুদের—

'আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি। অনুগত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

পাত্রীর ডাকনাম ফুলি, ভালো নাম ভবতারিণী। বিয়ের পর স্বামী রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর আর একটি ডাকনাম পদ্মের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেন মৃণালিনী। শুরু হল তাঁদের দাম্পত্য জীবন।

উনিশ বছরের ছোট্ট দাম্পত্য জীবন আর কিছুক্ষণ বাদেই ছিন্ন হবে। তাহলে আবার ফিরে যাই সেই বিদায়ের ক্ষণটিতে! ১৯০২ সাল। তাঁর অত্যন্ত প্রিয়তমা সাথী ছোটবউ মৃণালিনী দেবী রোগশয্যায় অন্তিম শয়ানে। আর তাঁর ফিরে আসার কোনও আশা নেই। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই জীবনের হাত ছেড়ে তিনি চিরতরে পাড়ি জমাবেন ওপারে, যেখান থেকে কোনওদিন আর ফিরে আসা যায় না। কবিগুরু সেদিনও ছিলেন বড়ই শান্ত। মনের ভেতরে প্রবল ঝড় উঠলেও তিনি তা বাইরে প্রকাশ করেননি। তাঁর চোখের সামনেই এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে শেষবারের মতো নিঃশ্বাস নিয়ে চির ঘুমের দেশে চলে গিয়েছিলেন তাঁর উনিশ বছরের সুখ-দুঃখের সাথী মৃণালিনী দেবী।

ছোটবউকে অগ্নিশয্যায় সমর্পণ করে তিনি বাড়ি ফিরে চলে গেলেন ছাদে। যাওয়ার আগে বলেছিলেন, আমাকে আজ রাতে কেউ ডাকতে যেও না। তাঁকে সে-রাতে কেউ বিরক্ত করেননি। সারা রাত তিনি ছাদে পায়চারি করেছিলেন, হয়তো সকলের অলক্ষে খোলা আকাশের নীচে স্ত্রীর জন্য ফেলেছিলেন দু'ফোঁটা চোখের জল। মৃণালিনী দেবী হয়তো সান্ত্বনা দিতে সেই মুহূর্তে বাতাসে ভর করে ছুঁয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমের শরীর। ভোরে সূর্যদেবকে প্রণাম করে কবি নেমে এসেছিলেন কর্মকোলাহল মুখর জীবনে। তারপর তুলে নিয়েছিলেন আরও গুরুদায়িত্ব, স্ত্রীর অসমাপ্ত কাজ, নাবালক সন্তানদের প্রতিপালন।

মৃত্যু মৃণালিনী দেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও তিনি কিন্তু স্বামীর কাছ-ছাড়া কখনও হননি। ঘুরে ফিরে তিনি বারেবারে এসেছেন স্বামীর কাছে। মিডিয়ামের মাধ্যমে কথা বলেছেন স্বামীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে আরও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একে একে চলে গিয়েছেন কবিগুরুর তিন সন্তান—শমীন্দ্রনাথ, রেণুকা ও মাধুরীলতা।

৫ নভেম্বর ১৯২৯, জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘর, উমাদেবীকে নিয়ে কবি বসেছেন পরলোক চর্চায়। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ দেখলেন মিডিয়ামের হাত থরথর করে কাঁপছে। কবি বুঝতে পারলেন ওপারের কোনও অতিথি এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।



কবি জানতে চাইলেন, কে?
—না, বলব না, আমার নাম তুমি বলো?
ছোট বউ নাকি?
—হ্যাঁ।

—কেমন আছ?

—যাদের ভালোবাসি তারা তো একে একে আমার কাছে এল।

পৃথিবীর সঙ্গে তোমার বন্ধন কি প্রবল আছে?

—আছে বইকি! একথা জিগ্যেস করো কেন? জানো না কি?

আমার কাজকর্ম সাধনার প্রতি তোমার interest আছে?

—আছে। আমার মন সমস্ত অন্তর থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করে।

রথীর কাজে তোমার সম্মতি আছে?

—সে কি আমায় জিজ্ঞাসা করবার! তার কাছে যিনি আছেন, তিনি দেবতার মতো আলো দেখাবেন।'

শুধু একবার নয়, নতুন বৌঠানের মতোই মৃণালিনী দেবীও মিডিয়ামের মাধ্যমে স্বামী সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় বারে-বারে এসেছেন, গল্প করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই দুই নারীর সঙ্গে কথা বলে যথেষ্ট আনন্দ পেতেন, খুশি হতেন। হয়তো মনের কোণে জমে থাকা শোক কিছুটা হালকা হত।

মৃত্যু বারেবারে আঘাত করেছে কবিকে, ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে অসংখ্য প্রিয়জনকে। আর সেই শোক থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য তিনি বারেবারে ছুটে গিয়েছেন খোলা আকাশের নীচে তাঁর প্রিয় ছাদটিতে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় নতুন বৌঠানের অকাল মৃত্যুর পরও কবিকে কাটাতে হয়েছে বহু বিনিদ্র রাত। খোলা ছাদে তিনি রাতের পর রাত পায়চারি করেছেন। এই মৃত্যুর পর অস্থির রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক গদ্য কবিতাগুচ্ছে লিখলেন, 'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পারো, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না। এমন একদিন আসিবে, যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারোও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই। এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর এক দেশে আর এক নতুন কবির কবিতা শুনিতেছ?...'

নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী তাঁর অতি আদরের দেওর, বাল্যসাথী রবীন্দ্রনাথকে কখনও ভুলতে পারবেন না। তিনি ফিরে আসবেন, বারে-বারে ফিরবেন, যোগ্য মিডিয়াম উমা দেবীর মাধ্যমে, তাঁর হাত ধরে।



'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' 'জীবিত ও মৃত'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এখানেও এসেছেন কাদম্বরী দেবী, তবে নিজ নামে নয় কাদম্বিনী নামে। এই গল্পের শেষ অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সে কী হল! শোনাব আপনাদের। 'কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না; তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, 'এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন; খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল; দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী 'ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই' বলিয়া চিৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'

অভিমানী কাদম্বরী দেবী স্বেচ্ছামৃত্যুর বুকে ঝাঁপ মেরে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন সমগ্র ঠাকুর পরিবারকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুশোক অল্পদিনেই হারিয়ে গিয়েছিল ঠাকুর পরিবারের বেশিরভাগ মানুষের মন থেকে। কিন্তু

কাদম্বরীকে আমৃত্যু হৃদয়ে বহন করেছিলেন দুজন মানুষ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ।

মিডিয়ামের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে বারবার তো এনেছেনই,—শুধু তাই নয়, তিনি একবার নতুন বৌঠানকে দর্শন করতেও চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মাকে বলেছিলেন, 'নতুন বৌঠানকে বলেছিলুম দেখা দিতে, চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। পারবেন?' উত্তরে নতুনদাদা বলেছিলেন, 'তার ইচ্ছাশক্তি যে কত দূর, তা তো জানিনে! তবে খুব একটা ইচ্ছাশক্তি তোমাকেও প্রয়োগ করতে হবে।'

অমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' গ্রন্থে লিখছেন, 'উমা দেবীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অনেক আত্মা এনেছেন।...তবে সব অধ্যায়ের লিপিবদ্ধ বিবরণ নেই। সম্ভবত গোড়ায় প্রশ্ন ও উত্তরগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে রাখার প্রয়োজন কেউ মনে করেননি কিংবা হয়তো উমা দেবীর হাতের লেখা যত্ন করে তুলে রাখার কথাও কেউ ভাবেননি। তাই পুজোর ছুটিতে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে যে সব আলাপ হয়েছিল তার কোন বিবরণ নেই।'

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাস। মিডিয়ামের মাধ্যমে এলেন কাদম্বরী দেবী। কথাপ্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।' অতি পরিণত বয়েসে পৌঁছে 'বোকা ছেলে' সম্বোধনটি শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর, রাত্রি—আবার এলেন নতুন বৌঠান। তবে এবারও প্রকাশ করলেন না নিজ পরিচয়। মিডিয়ামের অস্থিরতা দেখে রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন কে?

উত্তরে তিনি বললেন—কুলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম। আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

তুমি নাম বলবে না?

—না।

একটা কবিতা লিখে দেবে?

—আমার বিদ্যে কি অজানা?

আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভালো ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি। তুমি জানতে?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম। কেমন করে বা বোঝাব!

আমি তোমাদের কিছু বুঝতে পারি না। কি করে আসো, কী করে যাও, কী করে থাকো—কিছুই বুঝতে পারিনে!

—শেষ রাত্রে শিরশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে। আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলেছিলুম একদিন। আমার অসুখ করেছে। তুমি যদি এসে থাকো আমায় একটু সেবা করে দাও।

—তুমি চাও। কিন্তু ভালো করে দেবার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কি মুশকিলে ফেলেছি।

কিছু মুশকিলে ফেলোনি। তোমার এখন যে রূপ আছে, সে কি আগের মতো। তোমায় আমরা যেমন দেখেছিলুম?

—শমীর ভাষায় বলা যায়, কারো বা ঝড়ের হাওয়ার মতো, কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।

তোমরা পরস্পরকে দেখো যে, জানো যে, সেটা কেমন করে হয়?

—হাওয়ার কি রূপ নেই!

আমাদের কাছে তো হাওয়ার রূপ নেই।

—ভাব আছে, গতি আছে, বেগ আছে।

তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কি ওইরকম প্রভেদ—যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার প্রভেদ?

—না, না অন্যরকম। বোঝানো যায় না। তুমি আমায় দেখলে ঠিক চিনবে। আমার ছায়াটা আজও আছে। প্রাণ আছে, দেহ নেই শুধু।

কবির সারাটা জীবন কেটেছে অকালে ঝরে যাওয়া নতুন বৌঠানের চিন্তায়। তাঁর বিভিন্ন লেখায় বারেবারে ফিরে এসেছেন নতুন বৌঠান। রবীন্দ্রনাথ তখন এলাহাবাদে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে বউঠাকুরানির একখানা আলোকচিত্র দেখেই সেই রাতে তিনি লিখলেন সেই বিখ্যাত কবিতা 'ছবি'—

'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।।
নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'

(রচনাকাল বঙ্গাব্দ : ৩ কার্তিক, ১৩২১, খ্রিস্টাব্দ : ২১ অক্টোবর, ১৯১৪,রচনাস্থান : এলাহাবাদ)

২২.০৬. ১৯১৭ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি এক পত্রে লিখলেন, 'আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন, শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি।'

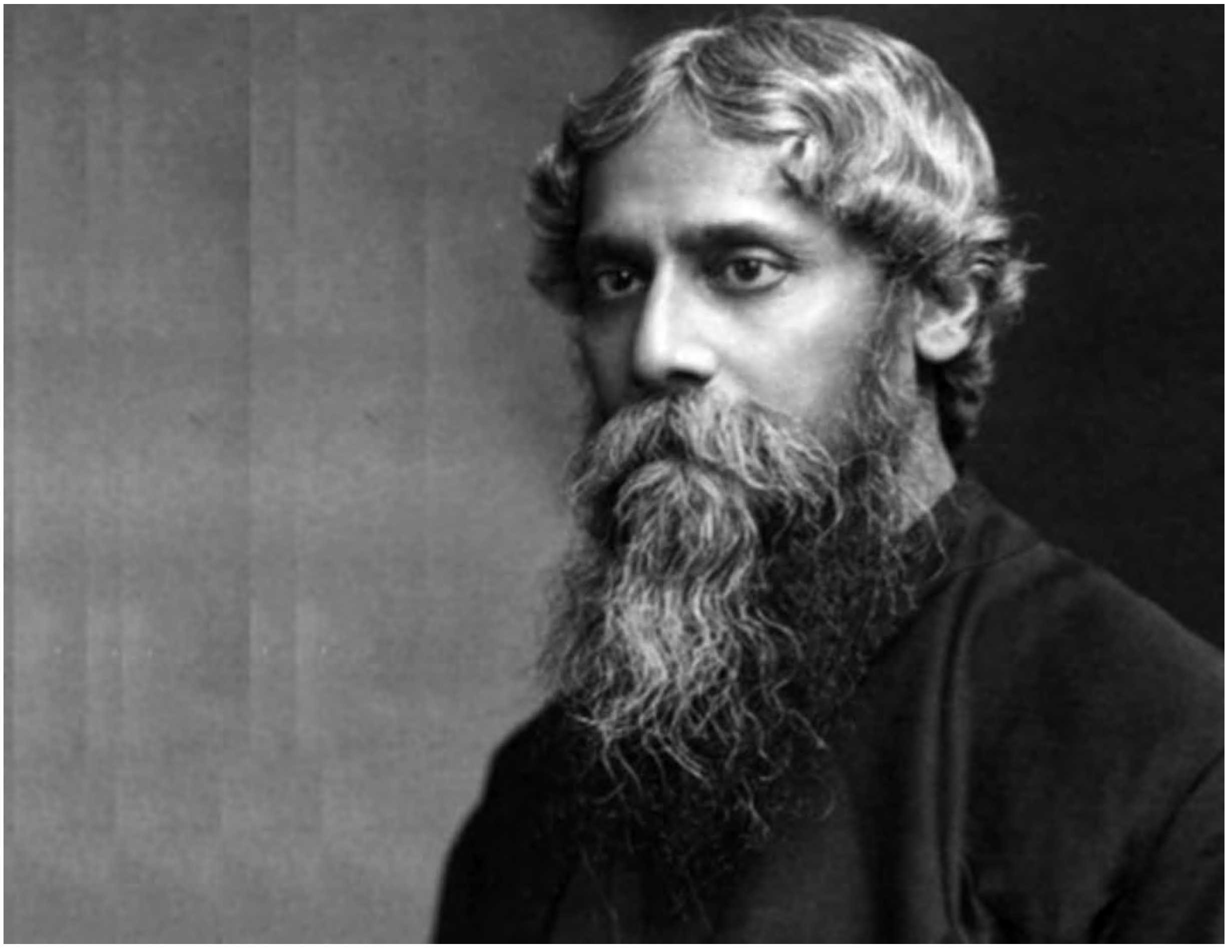


বাজার সরকার শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, ঠাকুর পরিবারের অন্যতম কৃতী ও গুণবান সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু জোড়াসাঁকোর সেই বিখ্যাত বাড়ির সদস্যদের সম্পর্কের ভিতে বোধহয় চোরা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। অনেকেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর জন্য তাঁর স্বামীর দিকেই আঙুল তুলতেন। তাঁরা মনে করতেন স্বামীর অবহেলা, কথার খেলাপ অভিমানিনী কাদম্বরী দেবী কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। বারে-বারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। কাদম্বরী দেবীর মনে তখন আর কোনও দ্বিধা ছিল না, সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার সময় মনে হয়তো কোনও ব্যথাই জাগেনি। তিনি মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিজেকে স্বেচ্ছায় সঁপে দিয়েছিলেন।

অন্য অনেকের মতো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কি নতুন বৌঠানের মৃত্যুর জন্য তাঁর নতুন দাদাকেই দায়ী বলে মনে করতেন! তা নাহলে কেন 'দুই প্রাণের ভাই' পরস্পর পরস্পরের থেকে চিরতরে দূরে সরে গিয়েছিলেন! সে কথা এখন থাক। আসুক মৃত্যু, ঝরে যাক অসংখ্য জীবন—আর সেই ভয়ঙ্করী মৃত্যুর ভয়াবহ আঘাত সহ্য করেও আমাদের প্রাণের মানুষ, মননের দেবতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন সেদিকে একবার চোখ রাখি। তিনি পেয়েছেন যত আঘাত, তত বেশি মেতে উঠেছেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। তাঁর কলম ঝরে নেমে এসেছে অসংখ্য কালজয়ী, বিশ্বজয়ী সৃষ্টি। একবার তাঁর লেখা ছোট্ট একটি গল্প 'প্রথম শোক'-এর কথা মনে করুন। তিনি লিখছেন, অবশ্যই তাঁর নতুন বৌঠানের কথা ভেবেই—আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ?'

সে বললে, 'এই দেখ না আমার গলার হার।' দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসেনি।

আমি বললেম, 'আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয়নি।'



আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, 'মনে আছে, সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও!'

লজ্জিত হয়ে বললেম, 'বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।'

সে বললে, 'যে-অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেননি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।'

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'একি তোমার অপরূপ মূর্তি!'

সে বললে, 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি।'

মা সারদা দেবী যখন মারা যান তখন কবি নিতান্তই বালক। ওই সময়ে মৃত্যুর ভয়াবহতা উপলব্ধি করার মতো বয়েস তাঁর হয়নি। শোক বস্তুটি কী তা তিনি সেদিন বুঝতে পারেননি। পরবর্তীকালে তাই তিনি লিখলেন, 'শিশুদের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুকে পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'



তিনি বুক পেতে মেনে নিয়েছিলেন নতুন বৌঠান, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও তাঁর প্রিয়তম সন্তান এবং প্রিয়জনদের মৃত্যু। তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্মের নিত্য সহায়ক হইয়া আমাকে বলদান করিবে।'

কবি ঠিক কথাই বলেছিলেন। মৃণালিনী দেবী দেহে না থেকেও যে-কোনও ছোট-বড় কাজে স্বামীর পাশে সবসময় থেকেছেন, দিয়েছেন পরামর্শ, কখনও বিরত করেছেন কোনও কর্ম থেকে। জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে, মিডিয়ামের হাত ধরে এসেছেন মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, রথীর কাজে তোমার সম্মতি আছে? উত্তরে মৃণলিনী দেবী বলেছিলেন, সে কি আমায় জিজ্ঞাসা করবার! তার কাছে যিনি আছেন, তিনি দেবতার মতো আলো দেখাবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইসময় এক মহাবৈপ্লবিক কাণ্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠাকুর পরিবারে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম বিধবা বিবাহ। পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হবে শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়নী দেবীর কন্যা, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি বিধবা প্রতিমা দেবীর।

প্রতিমা দেবীকে অসম্ভব স্নেহ করতেন মৃণালিনী দেবী। তাঁর ইচ্ছে ছিল পুত্র রথীর সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে দেওয়ার। কবিও জানতেন তাঁর স্ত্রীর এই ইচ্ছার কথা। প্রতিমা দেবীর যখন দশ বছর বয়েস সেইসময় তাঁর অভিভাবকরা বিয়ের কথা বলতে জোড়াসাঁকোতে এসেছিলেন, কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তখন রথীন্দ্রনাথের বয়েস মাত্র পনেরো বছর। তাই কবি তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য। কিন্তু সমাজের কথা ভেবে প্রতিমা দেবীর পিতা-মাতা অপেক্ষা করতে রাজি হননি। তাঁরা মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে। তবে এই বিয়ে

মোটেই সুখের হল না। বিয়ের ঠিক দু'মাসের মাথায় গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা গেলেন নীলানাথ। অপয়া অপবাদ মাথায় নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন বিধবা প্রতিমা দেবী।

এরপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন রথীন্দ্রনাথ। সেদিন মা মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, এবার হবে। ১৯১০ সালের ২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার অবশেষে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিয়ে সম্পন্ন হল। প্রতিমা দেবী পরবর্তীকালে লিখলেন, '১৩১৬ সাল ১৪ মাঘ আমার বিয়ের দিন। বয়স তখন ষোলো। আমার স্বামীর বয়স একুশ। পাঁচ নম্বর মামার বাড়ির পাশেই ছয় নম্বর শ্বশুর বাড়ি—তার পরদিন ১৫ মাঘ শ্বশুরবাড়ি এলুম...।'



রথীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পর্কে অমিতাভ চৌধুরী মহাশয় লিখছেন, 'অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধূ অমিতা ঠাকুরের কথায় আরও জানতে পারি, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ নাকি স্ত্রীকে অনেকবার এনেছিলেন। এমনকী প্ল্যানচেটে মৃণালিনী দেবীর সম্মতি না পাওয়ায় পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহের বহু সম্বন্ধ ভেঙে যায় এবং মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছানুসারেই অবনীন্দ্রনাথের বিধবা ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। প্ল্যানচেট ও মিডিয়াম নিয়ে শ্রীযুক্তা অমিতা ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি আমাকে বলেন, তাঁকে এই কথা বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, দীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী 'বড়মা' হেমলতা দেবী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, ১৩৫২ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় দেশবন্ধু ভগ্নী ঊর্মিলা দেবীর রচনার একটি অংশ। তাতে তিনি লিখছেন যে, তাঁর মেজদিদি অমলা দাসকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি (স্ত্রী) এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।' পুত্রের বিবাহবাসরে পূর্ব কথা স্মরণ করে অবশ্যই কবির মনে বেদনার ঝড় উঠেছিল! একদিন তিনিই পিতার আদেশ পালন করার জন্য ভেঙে দিয়েছিলেন আর এক বিধবার বিবাহ। তাঁর

আদরের ভাইপো বলেন্দ্রনাথ মারা যান মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে। পরিবারের অনেকের ইচ্ছা ছিল বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে পুনরায় পাত্রস্থ করার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুনরায় বিবাহে মত ছিল না। অন্য পুত্ররা সেদিন পিতার আদেশ পালন করতে চাননি, কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, ভেঙে দিয়েছিলেন সেই বিয়ে। এজন্য তাঁর অবশ্যই আক্ষেপ ছিল। পরবর্তীকালে তাই বোধহয় তিনি বলেছিলেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি সমাজচ্যুত।'



প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, ব্রাহ্ম নেতা, আচার্য, দানবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের শেষ উইলটি এবার করবেন। তাঁর মন আজকে বড়ই শান্ত, কাকে কী দেবেন তা পূর্ব রাত্রেই ঠিক করে ফেলেছেন। মনে আর কোনও দ্বিধা বা সংশয় নেই। কারণ তিনিও যে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মৃত্যুর পায়ের শব্দ—দিন ফুরিয়ে এল, এবার ফেরার পালা! তাই তিনি আজ বড়ই ব্যস্ত। সমস্ত কর্ম শেষ করতে হবে খুব শীঘ্রই। হাতে আছে আর মাত্র কয়েকটা বছর। তারপরই শেষ হবে এপারের সমস্ত খেলা।

সাল ১৮৯৯, ৮ সেপ্টেম্বর। উইল করলেন মহর্ষি। ওড়িশার সম্পত্তি পেলেন তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনে মিলে পেলেন নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজশাহীর কালীগ্রাম। কনিষ্ঠভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে এক হাজার টাকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, তাই মাসিক বারোশো পঞ্চাশ টাকা তাঁর জন্য ধার্য হল। সব মিলিয়ে ঠাকুর পরিবারের তহবিল থেকে এর জন্য খরচ নির্ধারিত হয়েছিল বাহান্ন হাজার চারশো টাকা।

সাল ১৯০৫। ঠাকুর পরিবারে আবার এক আঘাত নেমে এল। পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সেই মৃত্যুর হাত ধরেই পরিবারে প্রবেশ করল বিচ্ছেদ-বেদনা। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিখ্যাত সন্তানরা ছড়িয়ে পড়লেন নানা দিকে। পিতার উইল অনুসারে জমিদারির মালিক হলেন তিনজন—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উইল অনুসারে মাসে পেতেন মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা।

পিতার মৃত্যুর ঠিক তিন বছর বাদে ১৯০৮ সালে, স্বেচ্ছা নির্বাসনকেই বরণ করে নিলেন ঠাকুর পরিবারের অন্যতম আর এক কৃতী, সুদর্শন সন্তান—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি একদিনে ছিঁড়ে ফেললেন সমস্ত

মায়ার বন্ধন! কেন এই অহেতুক অভিমান! তিনিও কি তাঁর বারো বছরের ছোট প্রাণাধিক প্রিয় ভাইকে নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মনে করতেন! না! এ ব্যাপারে দু'পক্ষের কেউ-ই কিছু লিখে রেখে যাননি। ফলে পুরোটাই রয়ে গেল অন্ধকারে, কালের খাতায় চিরতরে বন্দি হয়ে!

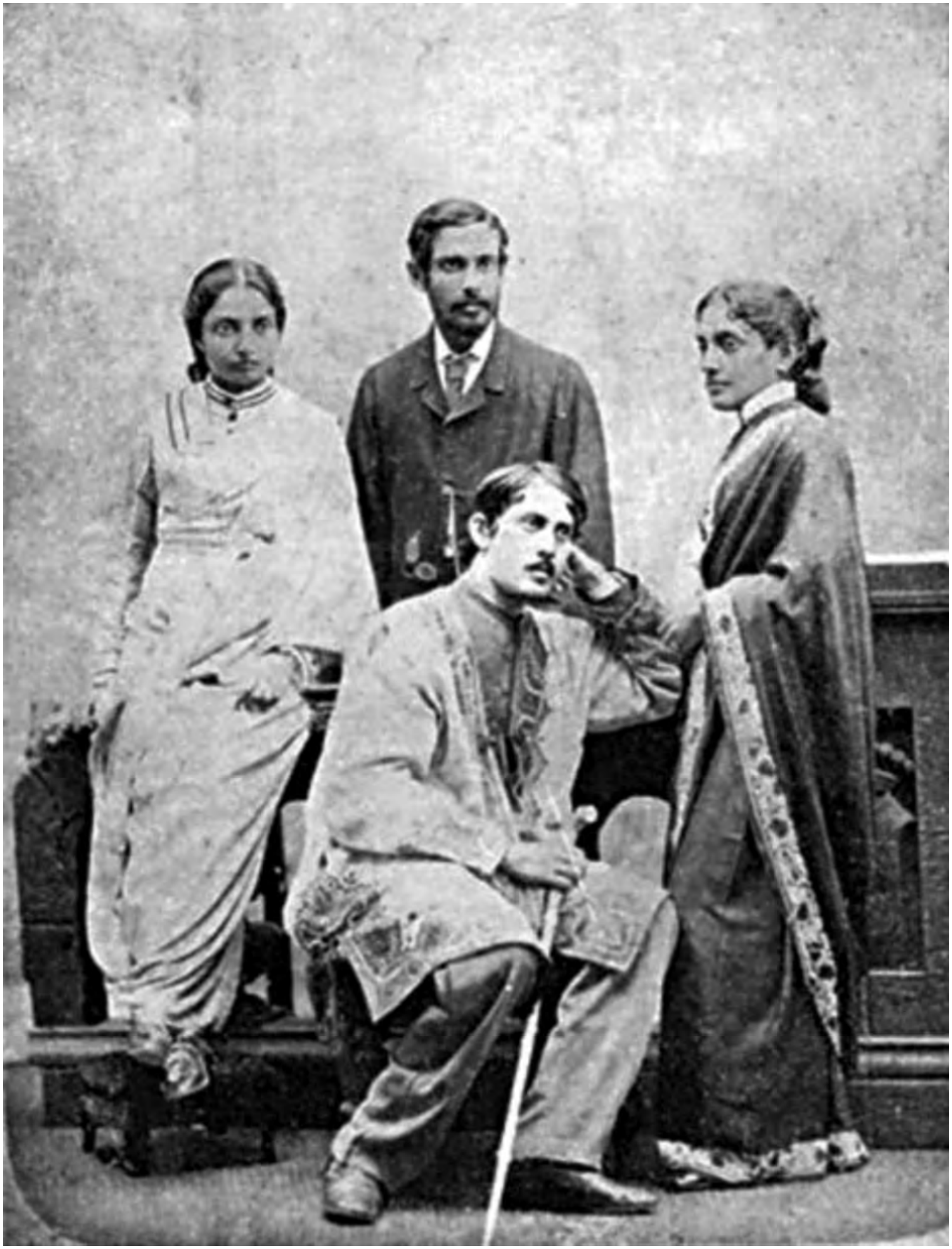
বারোশো পঞ্চাশ টাকা এই সামান্য অর্থ সম্বল করে পিতার মৃত্যুর তিনবছর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে চিরবিদায় নিলেন। তিনি চলে গেলেন রাঁচিতে। মোরাবাদী পাহাড়ে নবনির্মিত শান্তিধামেই তিনি কাটাবেন তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি।

ভেঙে গেল হাট! কলকোলাহল মুখর জোড়াসাঁকোর সেই বিখ্যাত বাড়ি থেকে একে একে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। রবীন্দ্রনাথ গেলেন জমিদারি পরিদর্শনে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ নতুন বাড়ি তৈরি করে জোড়াসাঁকো থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। চতুর্থ ও সপ্তম পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ আক্রান্ত হলেন মানসিক ব্যাধিতে।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯০৮ সাল, সেই শেষবার। তারপর আর দুজনের কখনও দেখা হয়নি। কবির অত্যন্ত প্রিয় জ্যোতিদাদাও কখনও শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা ভাবেননি এবং রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেননি কখনও রাঁচিতে যাওয়ার। দুই ভাই নিজেদের মধ্যে কী কারণে কেন যে এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন তা আমরা আজও জানি না।

ছোটভাই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন, ভাইকে চিঠি লিখে অভিনন্দন পর্যন্ত জানাননি। অথচ একসময় এই বারো বছরের ছোটভাইকে তিনি কত না প্রশ্রয় দিয়েছেন। সরোজিনী নাটকের প্রুফ পড়া হচ্ছে। ঘরে আছেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। তিনি তখন তাঁর নতুনদাদার ছায়াসঙ্গী। সরোজিনী পুরোটা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ নতুনদাদাকে বললেন, উপসংহারে একটা গান থাকলে ভালো হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্মতি জানিয়ে পিয়ানোতে বসে সুর তুললেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেই সুরে বসালেন বাণী—'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরান সঁপিবে বিধবাবালা।' কনিষ্ঠ ভ্রাতার পারদর্শিতায় মুগ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণিতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি।'

সেই অসম্ভব মধুর দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর ওপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি



করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।'

কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব সুখের দিন। দুই ভাই সরে গেলেন দু'দিকে দু'প্রান্তে। তবে শেষ বেলায়, ১৯২৫ সালে ছোটভাইকে শেষ বারের মতো দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি একবার রাঁচিতে আসবার জন্য ভাইকে চিঠিও লেখেন। খুব সম্ভবত সেই চিঠি রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয়নি। ফলে এই পৃথিবীর বুকে আর কোনওদিন দেখা হয়নি দুই ভাইয়ের।

অত্যন্ত প্রিয় নতুনদাদার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বারে-বারে প্ল্যানচেটে তাঁকে ডেকেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এসেছেন, নানা উপদেশ দিয়েছেন প্রিয় ভাইকে।

সাল ১৯২৯। চার বছর আগে রাঁচির শান্তিধামে মারা গিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। চার বছর পরে নতুনদাদা দ্বিতীয়বার এলেন ভাইয়ের আহ্বানে, মিডিয়ামের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন—'কে?

—পাঠিয়ে দিলেন তোমার নতুন বৌঠান।

জ্যোতিদাদা। সেদিন আপনার কথা শুনে আমার খুব উপকার হয়েছে মনকে শান্ত করতে পেরেছি।

—তুমি পারবে আমি জানি।

মৃত্যুর পরমুহূর্তে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ কী উপায়ে হয়?

—সে একটা আচ্ছন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে আসি। ঠিক যেন ঘুম থেকে জাগি। সমস্ত জীবনটাই গত রাত্রের স্বপ্ন বলে মনে হয়।

আমাকে এইমাত্র শমী বলল, একটা পৃথিবী তৈরি করেছে। খুব মজা লাগছে তার। সেটা কী?

—করেছে বটে, কিন্তু ও বলতে নিষেধ করেছে।

আমাকে বলেছে 'শমীর পৃথিবী' বলে কিছু একটা রচনা করতে।

—বেশ তো, লিখে দাও না। ওর মনে সত্যই অনেক কিছু খেলছে। ও যেন নতুন আলোক দেখতে পেয়েছে। আমাদের বুড়ো চোখে তা ধরা পড়ে না।...'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুবার এসেছিলেন ভাইয়ের পরলোক চর্চার আসরে। প্রথমবার আসেন ৫ নভেম্বর, দ্বিতীয়বার ২৮ নভেম্বর।



আবার মৃত্যু, কবি-জীবন থেকে ঝরে যাবে আরও একটি ফুল। কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা। ডাকনাম বেলা। কবির বেল ফুল-প্রীতির কথা পরিবারের সবাই জানতেন। সেই ভালোবাসার কথা মাথায় রেখেই কবির মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সদ্যোজাত কন্যার নাম রাখলেন বেলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কন্যাকে নানা নামে ডাকতেন, কখনও বেলা, কখনও বেল, কখনও বেলি, কখনও বা বেলুবুড়ি। অসাধারণ সুন্দরী এই কন্যাকে ঠাকুর পরিবারের সকলেই খুব ভালোবাসতেন। লেখার হাতটিও ছিল ভারি চমৎকার।

১৯০১ সালে নিজের কন্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লিখলেন, 'কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত। সমবয়সি ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুংকার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত, কি রকম লোভী অথচ ভালোমানুষ ছিল—আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম। দারজিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম।'

দিদিকে যে বাবা তাদের থেকে একটু বেশি স্নেহ করেন তা কবির অন্যান্য পুত্র-কন্যারাও বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন এবং তা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ বা বেদনা ছিল না। পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন, 'আর-সব ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাবা দিদিকে বেশি ভালোবাসতেন। আমরা সেটা খুবই জানতুম, কিন্তু তার জন্য কোনোদিন ঈর্ষা বোধ করিনি, কেন না আমরাও সকলে দিদিকে অত্যন্ত ভালোবাসতুম এবং মানতুম। দিদির বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তা মানতে আমাদের লজ্জাবোধ হত না। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। সেইজন্য বাড়ির সকলের কাছ থেকে প্রচুর আদর পেতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন। শিলাইদহে আমাদের যখন পড়াশুনা আরম্ভ হল,

দিদি আমাদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যেতে লাগলেন। বাবা তাঁকে নিজে পৃথক করে পড়াতে শুরু করলেন। তখন থেকেই বুঝেছিলেন দিদির লেখবার বেশ ক্ষমতা আছে। বাবা তাঁকে উৎসাহ দেওয়াতে তিনি কয়েকটা গল্পও লিখেছিলেন।'

মাধবীলতার অন্যতম লেখাগুলি হল—'সুরো', 'মামা ভাগ্নী', 'সৎপাত্র', 'দ্বীপনিবাস', 'অনাদৃতা', 'চোর', 'চামরুর গল্প', 'মাধুরীলতার গল্প'। তাঁর লেখা সবুজপত্র ছাড়াও ভারতী ও বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকাতেও প্রকাশিত হত। ১৩২২ সালে সবুজপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর 'অনাদৃতা' গল্পটি—'দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্রের ভার স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া হরমণি যখন চির অবসর গ্রহণ করিল, নীলু বড় ফাঁপড়ে পড়িয়া গেল। সে বেচারা ছাপাখানায় কাজ করিত, বেতন যাহা পাইত মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, সামান্য ২০ টাকায় কি করিয়া এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ সম্ভব তাহা তাহাকে একদিনও ভাবিতে হয় নাই। প্রত্যহ নিয়মিত ৯-১০টার সময় সে ডাক দিত, ''বড় বৌ, ভাত বাড়, আমি নাইতে যাচ্ছি।'' স্নান সারিয়া যেখানে হর পাখা হাতে ভাত আগলাইয়া মাছি তাড়াইতেছে সেখানে বসিয়া গিয়া সপাসপ নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া পানটি হাতে লইয়া আপিসের দিকে চলিয়া যাইত। নীলুর খাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না, মাছটি তরকারীটি যে সময়কার যা পাওয়া যাইত, নীলুর পাতে পড়িতই পড়িত, পরিবারের সকলেই তাহার মত রাজভোগে আছে সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের যে আহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত লোভ আছে এবং সেটা যে অত্যন্ত নিন্দনীয় সে কথা চাণক্যের শ্লোক মিশাইয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিত...।'

তবে লেখার ব্যাপারে মাধুরীলতা দেবীর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। আর এই কারণে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দুঃখ পেতেন। তাই প্রশান্ত মহলানবীশকে একটি চিঠিতে মাধুরীলতার রচনাশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ওর ক্ষমতা ছিল...কিন্তু লিখত না।'

কবির বড় আদরের এই প্রাণের কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে বিবাহ হল নতুন বৌঠানের প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র মজফফরপুরের উকিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর।



মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে একটি পত্রে লিখলেন, 'ভাই ছুটি, বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করছ ততটা নয়—বেলা সেখানে বেশ প্রসন্ন মনেই আছে—নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালোই লাগছে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি ভেবে দেখলুম, বিবাহের পরে অন্তত কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাকলে তার ব্যাঘাত ঘটে।'

বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় জামাইকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে পাঠালেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তাঁরা উঠেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই। তবে এই সুখ মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হল না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে খটামটি শুরু হল তাঁর ছোট ভায়রাভাই নগেন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের এই অকর্মণ্য ছোট জামাইটির আচার আচরণ মোটেই সুবিধার ছিল না। তিনি ছিলেন উদ্ধত ও অহংকারী প্রকৃতির মানুষ। শুধু শরৎচন্দ্র নন, তাঁর ব্যবহারে কবি-বন্ধুরাও বারেবারে ব্যথা পেয়েছেন।

তবে এই অশান্তির বীজ কবি নিজের হাতেই বপন করেছিলেন তাঁর পরিবারের ভূমিতে। আবার বিদেশে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যাত্রার পূর্বে জমিদারি, আদি ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও জোড়াসাঁকো বাড়ির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে যান ছোটজামাই নগেন্দ্রনাথের হাতে। শরৎচন্দ্র মুখে কিছু না বললেও শ্বশুরমশাইয়ের এহেন ব্যবহারে মনে হয়তো বড়ই আঘাত পেয়েছিলেন।

সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল একদিন, ভয়ঙ্করভাবে। সকালের খবরের কাগজ কোন জামাতার ঘরে আগে দেওয়া হবে তাই নিয়েই শুরু হল মনোমালিন্য। ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর হাত ধরে পথে নামলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে তাঁরা গিয়ে উঠলেন ২৭/১ ডিহি শ্রীরামপুরের ভাড়া বাড়িতে।

সামান্য কাগজ নিয়ে এতবড় অশান্তি? পরবর্তীকালে কেউ কেউ হেমলতা দেবীর জবানিতে জানিয়েছেন, নগেন্দ্রনাথ খরচ কমানোর নামে ভায়রাভাই শরৎচন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট স্টেটসম্যান কাগজ বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের অনুরক্ত পাঠক শরৎচন্দ্র এতে যারপরনাই অপমানিত বোধ করেন। তারপর কলহের সংক্রমণ।

এই বিবাদ সৃষ্টি করল এক বিশ্রী পরিস্থিতির। দুই বোনের মধ্যে কথা বলা এবং মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। তাতেও বিন্দুমাত্র দমলেন না উদ্ধত, ক্ষমতালোভী, অহংকারী নগেন্দ্রনাথ। আর বেলা! তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন পিতার বৃহৎ বৃত্ত থেকে।



বিয়ের বারো বছর বাদে কন্যা সন্তানসম্ভবা হয়েছে জেনে কবি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তখন আমেরিকায়। তিনি মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীকে টেলিগ্রাম করে বেলার সাধভক্ষণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি বাড়ির খাজাঞ্চি যদু চট্টোপাধ্যায়কে পাঁচশো টাকা এই কারণে মেজ বৌঠানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দেন।

তিনি আমাদের অশান্ত জীবনে বারে বারে শান্তির বারি সিঞ্চন করেছেন। অসংখ্য সুখ, দুঃখের দিনে তাঁর লেখা পাঠ করে আমরা পেয়েছি অপার শান্তি। অথচ সেই মানুষটির জীবন পথ ছিল কণ্টকময়। বারে বারে পেয়েছেন আঘাত, অসংখ্য মৃত্যু-শোক তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, অপমানিত হয়েছেন প্রিয়জনদের কাছ থেকে।

পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করার কিছুদিনের মধ্যেই কোনও অজ্ঞাত কারণে মাধুরীলতার সন্তানটি মারা যায়। এই ভয়াবহ খবরটি তখনও জানতেন না কবি। তিনি তখন আরবানায়। সেখান থেকে জোড়াসাঁকোর ঠিকানায় কন্যা বেলাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কবির প্রিয় 'বেল' তখন চলে গিয়েছেন অন্য ঠিকানায়—ডিহি শ্রীরামপুরে। ফলে এই ঠিকানা কেটে সেই ঠিকানায় আবার চিঠিটি পুনরায় পাঠানো হয়। কিন্তু সেই চিঠির কোনও উত্তর কবি পাননি।

ওদিকে মাধুরীলতা অসংখ্য বেদনায় বিপর্যস্ত হয়ে তিনিও ক্রমশ হয়ে উঠছেন অন্তর্মুখী। তিনিও বোধহয় তাই তাঁর পিতাকে এতবড় শোকের খবরটি জানাতে চাননি, কিংবা পিতার ওপর প্রবল অভিমানে তিনিও হয়তো ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন কবির কাছ থেকে। পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'বেলার দুঃখের দিনে—প্রবাসী পিতার নীরবতা তাঁর কাছে প্রতিভাত বিস্ময়কর উদাসীনতা। কবির সুদীর্ঘদিন ইংল্যান্ড-

আমেরিকা ভ্রমণের ব্যস্ততায় বেড়ে যায় বেলা-শরৎকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দূরত্ব। অভিমানহত কন্যার সঙ্গে পিতার সম্পর্ক আর কখনও স্বাভাবিক হয়নি—রবীন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। বিস্ময়ের বিস্ময়—ভুবনবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথকে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতে হয় জামাতা শরৎকুমারকে। আর কবি সে চিঠি লিখছেন এমন নত হয়ে যেন সব অপরাধ তাঁরই—যেন তাঁর আচরণই, তাঁর দুর্ব্যবহারই সব অশান্তির মূলে। অথচ কী গভীর বেদনা ও দুর্ভাগ্য কবির—জামাই তো দূরের কথা তাঁর অতি আদরের বেলাও যতদিন বেঁচে ছিলেন দুঃখের তাপস পিতাকে ভুল বুঝেই থাকলেন।'

আবার মৃত্যুর আক্রমণ! আবার পরাস্ত হবেন কবি। অভিমানিনী বেলা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘুসঘুসে জ্বর ও কাশি দিয়ে শুরু হল উপসর্গ। সেই সমস্যার হাত ধরেই কবির আদরিনী বেলার শরীরে প্রবেশ করল ক্ষয়রোগ।

যে-কোনও পিতার কাছে কন্যার স্থান সবার ওপরে। কন্যারা হলেন পিতার জীবনের অ্যাঞ্জেল। কন্যার প্রবল অসুস্থতার খবর পেলেন পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আবার মনে পড়ল কন্যা রেণুকার কথা। বিদায়ের আগে সেই মেয়েও তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর দিকে—ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ স্বরে বলেছিল—বাবা, সব অন্ধকার হয়ে আসছে। কিছুই আর দেখতে পাচ্ছি না। তুমি পিতা নোহসি মন্ত্র পড়ে শোনাও আমাকে। আর আজ! আদরের বেলি মিশে যাচ্ছে রোগশয্যায়, আর দেরি নেই। বেলাও হয়তো শুনতে পাচ্ছে তার পদশব্দ। শীতল পদশব্দ! তাই ছোটবেলার মতো বাবার হাত ধরে আবদার করছে, বাবা, আমাকে গল্প শোনাও। কঠিন কঠোর কবির হৃদয়ে তখনই শুরু হচ্ছে অঝোরে রক্তক্ষরণ। অদৃশ্য সেই রক্তক্ষরণে বারে বারে কবি-জীবন পিচ্ছিল হয়েছে। তবু তিনি থেকেছেন শান্ত, সৃষ্টির উল্লাসে ডুবেছেন বারে-বারে।

রবীন্দ্রনাথ আদরের কন্যাকে গল্প শোনাতেন। কারণ তিনি প্রায় প্রতিদিনই দেখতে আসতেন কন্যাকে। লক্ষণ বুঝে হোমিওপ্যাথি ওষুধও দিতেন, আর শোনাতেন গল্প।

সাল ১৯১৮। মাত্র বত্রিশ বছর বয়েসে ঝরে গেলেন অভিমানিনী মাধুরীলতা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও কবি কন্যাকে দেখার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন, পৌঁছে খবর পেলেন বেলি আর নেই। তিনি আর গাড়ি থেকে নামলেন না। ফিরে এলেন কলকাতায়।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখছেন, '...শেষদিন পর্যন্ত রোজ দুপুরে দিদির কাছে যেতে লাগলেন। সেদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ যখন ডিহি-শ্রীরামপুর রোডের বাড়ি পৌঁছলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় 'বিচিত্রা'র বৈঠক ছিল। বাবা সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্পসল্প যেমন করেন, সেদিনও তাই করলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে একজনও কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারল না যে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, মনের কী অবস্থা নিয়ে বাবা তাঁদের সঙ্গে সদালাপ করেছেন।'

মাধুরীলতার মৃত্যুর এগারো বছর পর, কবি সেদিনও বসেছেন পরলোকচর্চায়। পিতা আহ্বান করলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়া কন্যা মাধুরীলতাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা। কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন মিডিয়াম। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন ঘরে কোনও অতিথি এসেছেন। তিনি মৃদু স্বরে জানতে চাইলেন 'কে তুমি?

—বেল।

বেলা? ভালো আছিস?

—হ্যাঁ, বেশ আছি।

পৃথিবীর সব কথা মনে আছে? এখানের সঙ্গে তোর যোগ আছে?

—আছে বইকি।

শমীর (শমীন্দ্রনাথ) সঙ্গে দেখা হয়? তাকে পাস কাছে?

—হ্যাঁ, এই তো কাছেই ছিল। এখনও আমার কাছেই রয়েছে।

সে ভারী চঞ্চল, না? শমী?
—হ্যাঁ, ভারী চঞ্চল।
এখনও সে কি বড় হয়নি? তার চঞ্চলতা কি ঘুচল না?
—না, এখনও কেউ ওকে সামলাতে পারে না। সবারই প্রিয় ও।
আগে মনে আছে তো, কবিতা শুনতে ভালোবাসত—পঞ্চনদীর তীরে— এখনও সেই ভাব আছে ওর?
—কবিতা যখনই পড়ো, ও ছুটে যায়, আমাদেরও টেনে আনে।
ভালো লাগে? আমার কবিতা শুনিস?
—বেশ সুন্দর।
সেদিন যে অভিনয় হয়েছিল তপতী, শুনেছিলি?
—বাঃ, ছিলুম যে সেইদিন।
ভালো লেগেছিল?
—বড় সুন্দর। শুধু দেখা নয়, পাওয়া জানা অনুভব করা।
আমি যুবা সেজেছিলুম। আমাকে দেখেছিলি?
—মানিয়েছিল সুন্দর।
অমিতাকে কেমন লাগল?
—ভালো।
শান্তিনিকেতনকে মনে পড়ে?
—পড়ে বইকি।
এই যে এখন এখানে আছি—সব জানতে পারছিস, বুঝতে পারছিস?
—জানি সব, আর এত বেশি জানি। যখন বিদেশে থাকতুম, তখন এত কি সম্ভব হত?
শমী তোর কাছেই আছে এখন?
—হ্যাঁ।
বিদায় নিলেন মাধুরীলতা। তিনি তাঁর প্রিয় পিতার কাছে এসেছিলেন একবার, দিনটি ছিল ২৮ নভেম্বর।



সুকুমার রায়। শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স রাইম'-এর প্রবর্তক। তিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। বলতেন আমার যুবক বন্ধু।

সেই সুকুমার রায় আজ মৃত্যুশয্যায়। কালাজ্বরে আক্রান্ত। যুবক বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কবি শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে দেখতে চলে এলেন কলকাতায়। সুকুমার রায়ের অনুরোধে তিনি সেদিন গেয়েছিলেন দু'খানি গান—'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' এবং 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—'

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে।।
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভ'রে—

কালিমা যায় মেজে।।

—শেষের এই গানটি রোগীর অনুরোধে কবিকে সেদিন দুবার গাইতে হয়েছিল।

কবি শান্তিনিকেতনে উপাসনায় বললেন, 'আমার পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি, এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে, জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে। যে-কোনও মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে স্পষ্ট করে তোলেন, অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ু নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগ শয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

চলে গেলেন সুকুমার রায়। তিনি আবার ফিরবেন ছ'বছর বাদে, বৃদ্ধ বন্ধুর আহ্বানে পরলোক চর্চার আসরে। তিনি কবিকে সেদিন বলবেন, আচ্ছা, আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন?

উত্তরে কবি বলেন, তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।

—তাঁকেও বলুন না।

কবি বললেন, তাকে পেলে আমিও খুশি হব।

প্রয়াত সুকুমার রায়ের সঙ্গে কথা বলার কিছুদিন বাদে কলকাতায় এসে কবি কথা বললেন সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে। সুকুমার রায়ের স্ত্রী, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, শিল্পী, লেখক, সুরকার ও সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীও অসম্ভব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। কবির মুখে মৃত স্বামীর অনুরোধের কথা শুনে তিনি বললেন, আমার ছেলের বয়েস এখন মাত্র আট। এই মুহূর্তে আমি তাকে ছাড়তে পারব না। কিন্তু একটু বড় হলে অবশ্যই আপনার আশ্রমে তাকে পাঠাব। কথা রেখেছিলেন সুপ্রভা দেবী। ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন সুকুমার-সুপ্রভা রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়।

সেদিন কবির সঙ্গে তাঁর যুবক বন্ধুর নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, তিনি প্রথমেই আহ্বান জানিয়েছিলেন সুকুমার রায়কে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিডিয়ামের অস্থিরতা দেখে কবি জানতে চেয়েছিলেন, তুমি এসেছ?



সুকুমার কেমন আছ তুমি?
—অন্য কথা বলুন।
তোমার পৃথিবীর সঙ্গে এখনও যোগ আছে?
—আছে, খুব।

আমাদের এখানকার রচনার কাজ, অন্য কাজ—তাতে তোমার মন আছে?

—আছে বইকি এখনও তো তাই নিয়েই আছি।

তোমার এখানকার রচনার প্রতি অনুরক্তি আছে?

—রচনা তো কাগজে হয় না, মনের মধ্যে আছে।

আমাদের কাউকে অবলম্বন করে করতে পারো রচনা?

—শক্ত। কার হাতে?

বুলার হাত দিয়ে ছবি আঁকো কিংবা লেখো।

—বড় শক্তির প্রয়োজন। আমার ভাব যেন এক সৃষ্টি ও বিনাশের মাঝখান দিয়ে চলেছে।

আমাদের কাছে কিছু বলবার আছে?

—আছে। বলুন আপনি, কতদিন, কতদিন আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে?

—শুনুন, আমি যেন কী মহান আলোকের মধ্যে রয়েছি। আমার চোখ সেই আলোয় ডুবতে চায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কী অন্ধকার—

আলো মনকে আশ্রয় করে, না দেহকে?

—আমার মন এখন সর্বস্ব। আমার মন—।

ওটা আর একবার বলো।

—আমাদের মনকে পূর্ণ করতে পারলে, অর্থাৎ দেবতাকে...কিন্তু আমার ধর্ম বিশ্বাস আলাদা।

আমার নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটা লেকচার (হিবার্ট লেকচারের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান') লিখেছি, জানো?

—সে ঠিকই করেছেন। আমার মন ওই চায়।

আমাদের সাধনায় সাহায্য করতে পারো?

—সাধনায়?

আমরা যেটা ইচ্ছা করি, কামনা aspire করি, তাতে সহায়তা করতে পারো?

—আপনাকে আমার দরকার। আমার নিজের সাধনা আজও শেষ হল না।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলবে?

—কিছু না।

ব্রাহ্মসমাজের ওপর শ্রদ্ধা আছে?

—না, ওপথ ঠিক নয়।



ব্যক্তিগত সাধনা, এই তোমার বলবার কথা?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই।

প্রশান্ত (মহালানবীশ) এখন যে কাজে নিযুক্ত, তাকে তুমি অনুসরণ করছ?

—সমস্তই।

এই পথে সে সার্থকতা লাভ করবে?

—যখন এলাম, মনে হল পৃথিবীতে আমার মনের ধারা পূর্ণ বিকাশের পথে চলেছে।

রানির আরোগ্য?

—বলতে পারি না।

আমি যে ছবি আঁকি, সে কি ভালো?

—হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, অপূর্ব।

ইউরোপে তার সমাদর হবে?

—হবে।

দীর্ঘ কথোপকথন। ফেরার বেলায় সুকুমার রায় আবার শুনতে চাইলেন কবিতা বা গান। কবি কবিতা নয়, গাইলেন গান—

'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোনখানে রে কোন পাষাণের ঘায়।।
নবীন তরী নতুন চলে—দিইনি পাড়ি অগাধ জলে

বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়...।'



'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট, রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু-অমৃত করে দান।।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিখুঁত শরীরে পৃথিবীকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে। অস্ত্রোপচারে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। ডাঃ নীলরতন সরকারও তাঁর পক্ষে ছিলেন। ডাঃ সরকার অন্য চিকিৎসকদের বলেছিলেন, 'দেখুন, রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ রোগীর মতো দেখবেন না। তাঁর স্নায়ু, তাঁর শিরা-উপশিরা দৈহিক গঠন সবই অসাধারণ। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষের দেহের পক্ষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।'

কবিও চাননি তাঁর অপারেশন করা হোক। অপারেশন হয়েছিল তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি বারবার, হাজারবার বলেছিলেন, 'শরীরে খুঁত নিয়ে মরতে চাই না। বয়েস হয়েছে, বিদায় নেবই তো, স্বাভাবিকভাবেই সব শেষ হোক, কাঁটা ছেঁড়া কেন?'

তবু অপারেশন হল! ডাক্তার ললিতমোহন ব্যানার্জি কবির অপারেশন করলেন। আর সত্যি হল রবীন্দ্রনাথের কথা। অপারেশনের প্রবল ধকল সহ্য করতে পারল না তাঁর শরীর। কবির প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষাকাল, আর তাঁর তিরোধানের দিনটি ছিল বাইশে শ্রাবণ।

পালঙ্কে শুয়ে আছেন আচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর পরিবারের অন্যদের সঙ্গে ছিলেন ডাঃ জ্যোতিষ রায়। সেইসময়, শেষ মুহূর্তে পরিবারের কেউ একজন তাঁর কানের কাছে মুখটি নিয়ে গিয়ে শোনাচ্ছেন 'শান্তম অদ্বৈতম' মন্ত্র, তার পাশাপাশি চলছে অবিরাম ব্রহ্মসঙ্গীত। আর এর মাঝেই ডাঃ জ্যোতিষ

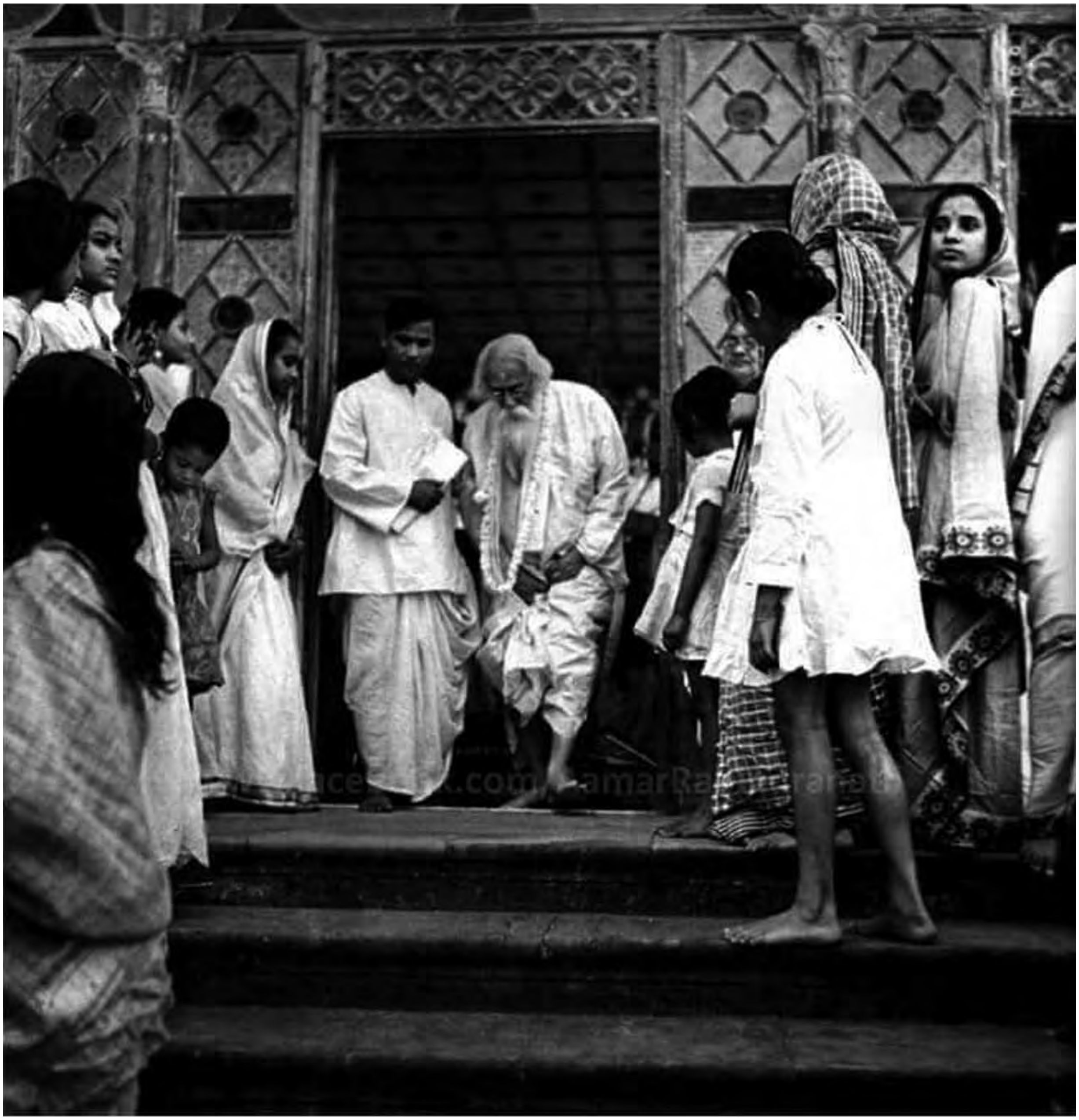
রায় কবির নাড়ি টিপে ঘোষণা করলেন—'সব শেষ।' জীবনের হাত ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিলেন আমাদের প্রাণের কবি, মননের কবি, এই পৃথিবীর কবি—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরলোকচর্চায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর পরে তিনি এলেন রাজেন্দ্রলাল আচার্যের পরলোক চর্চার আসরে।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের 'দৈনিক মাতৃভূমি' পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল আচার্য সম্পর্কে প্রতিবেদক লিখছেন, 'রাজেন্দ্রলাল আচার্য বাবু ইতঃপূর্বে বিশেষ 'বাঙ্গালীর বল ও বাঙ্গালীর ধর্মগুরু' নামক ২য় খণ্ডের পুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত হইয়াছেন।' অতএব এটা ধরে নেওয়া যেতে পারেই যে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পরিচয় ছিল।

দিনটি ছিল ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল। রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর 'মৃত্যুর পরপারে' গ্রন্থে কবির সঙ্গে তাঁর একান্ত আলাপচারিতার কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, কবিকে আমি অনুরোধ করে বললাম, আমি একটা বই লিখছি, সেই বইয়ের জন্য আপনার মহাযাত্রার বর্ণনাটি লিখে নিতে চাই।

কবি বললেন, 'তা বেশ লিখে নাও। কবি বলতে থাকলেন, আর আমিও শুরু করলাম লেখা—আমি কলকাতায় যখন দেহত্যাগ করলুম, তখন দেখলুম যে দেহ থেকে একটা সাদা কুয়াশা যেন বেরিয়ে এল। আমার সেই পরিত্যক্ত দেহ ঘিরে আমার আত্মীয়-পরিজনরা তখন কাঁদছে। আমি তাদের বলার চেষ্টা করলুম, আমি মরিনি, এই তো আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমার কোনও কথাই শুনতে পেল না, কাঁদতেই থাকল। তাদের জন্য আমার সেইসময় বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। তাই তাদের কথা ভেবে আবার আমি চেষ্টা করলুম আমার সেই পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করবার। বারবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। সে সময় আমার চেহারাটা ছিল ধোঁয়ার মতো। হাত-পা সবই তখন আমার ছিল, তবে সবটাই ধোঁয়া দিয়ে যেন তৈরি। তখনও পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে আমার মৃত্যু হয়েছে।



যখন আর পরিত্যক্ত শরীরে ফেরা গেল না তখন আমি একটু বিরক্তই হয়ে পড়লাম। আর এমন সময় দেখলাম আমার চারপাশে কয়েকজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের শরীর থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছিল। তাঁদেরই একজন আমাকে মধুর কণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন, কবি আপনি তো আর বেঁচে নেই, আপনার মৃত্যু হয়েছে।

আমি বললুম, কখন আমার মৃত্যু হল!

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের সঙ্গে এবার চলুন, সত্যিই আপনার মৃত্যু হয়েছে। এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। বৃথাই কষ্ট পাবেন।

আমি বললাম, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?

তিনি বললেন, চলুন কোনও ভয় নেই। আপনার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, আমরা আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাব।

বললাম, চলুন তাহলে।

শুরু হল আমাদের পথ চলা। তাঁরা আমাকে এক ঘন কুয়াশাপূর্ণ স্থান দিয়ে নিয়ে চললেন সামনের দিকে। দীর্ঘ সে যাত্রা। একসময় আমি তাঁদের বললাম, দেখুন আমার শরীর বড়ই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আর যে আমি হাঁটতে পারছি না।

তখন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। এই কুয়াশাচ্ছন্ন পথের শেষ হবে সামনে। ওই দেখুন সামনেই আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটু কষ্ট করুন।

আমি খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলুম। একটুখানি গিয়েই দেখি চারিদিকে বেশ আলো জ্বলছে—যেন চাঁদের আলো—কিংবা তার চেয়েও যেন জোর আলো।

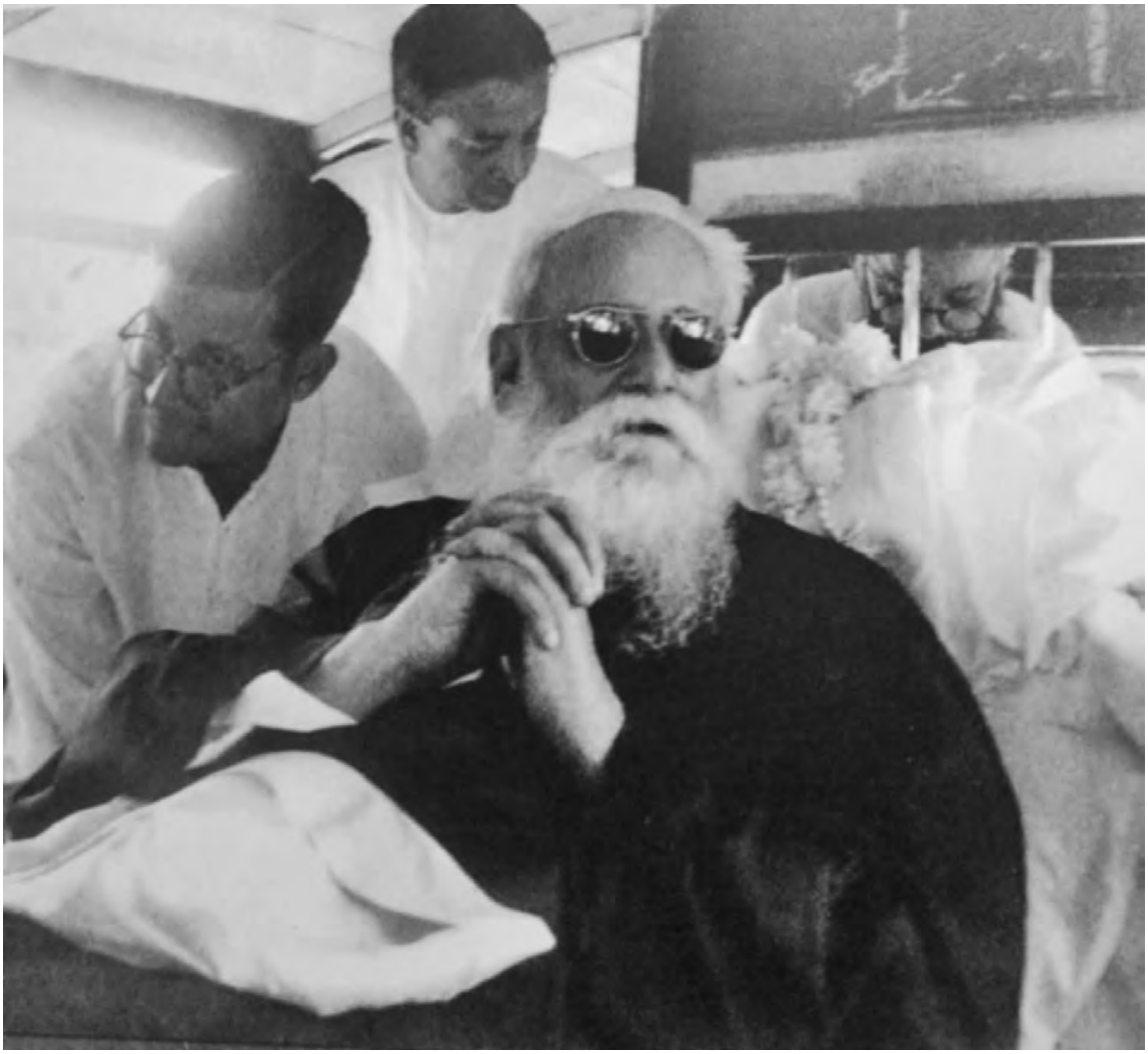
আমি তাঁদের বললুম, আমি তো আর চলতে পারছি না। এইখানে একটু জিরিয়ে নিই। এই বলে সেখানেই বসে পড়লুম এবং পরক্ষণেই শুয়ে পড়লুম সেই ভূমির ওপর। শুতে-শুতেই এমন ঘুম এল যে আর কিছুই জানি না। ক'দিন ঘুমিয়ে ছিলুম তা বলতে পারব না। একদিন আমার ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার পিতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে আমি তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, রবি, ভয় নেই, আয় আমার সঙ্গে। আমি তোকে নিতে এসেছি।

আমি তাঁকে জিগ্যেস করলুম, সত্যিই কি আমি মারা গিয়েছি?

তিনি হেসে বললেন, সত্যিই তুই মারা গিয়েছিস রবি। এখন তোর নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে। এ শুধু ও-পার আর এ-পার। এরই নাম মৃত্যু।

আমি বললাম, এর জন্য তবে মানুষের এত ভয় কীসের?

তিনি বললেন, কিছু ভয় নেই। লোকে জানে না তাই ভয়ে মরে। চল না দেখবি চল।



বাবার পাশাপাশি আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।'

মৃত্যুর প্রবল হানাদারিতে কবির জীবন থেকে নানাসময়ে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর বহু প্রিয়জন। তাই বোধহয় মৃত্যুকে তিনি আর ভয় পেতেন না। বরঞ্চ ভালোবাসতেন, গভীর মমত্ববোধ ছিল মরণের প্রতি। তাই তিনি মৃত্যুর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন এই অনবদ্য কবিতাটি—

'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,

তোমার ইচ্ছার পূর্বে? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।'



মানুষটিকে আজ আর আমাদের তেমনভাবে মনে নেই। আর যাঁদের মনে আছে, তাঁদের কাছে তিনি পরিচিত শুধুমাত্র কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুরমশাই হিসেবে। তাঁর নামটি ছিল ভারী সুন্দর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন নামী তন্ত্রসাধক। এক ভৈরবীর কাছে তিনি নিয়েছিলেন তন্ত্রসাধনার দীক্ষা। একাকী শ্মশানে বসেছেন শবসাধনায়। জাগিয়ে তুলেছেন শবকে। গভীর নিশীথে ক্ষুধার্ত শব সাধকের কাছে বিকট চিৎকার করে আহার করতে চেয়েছেন। আর সাধক তাঁর করাল মুখগহ্বরে ঢেলে দিয়েছেন সঙ্গে আনা কারণের বোতল থেকে এক ঢোঁক কারণ এবং একমুঠো ছোলা ও চাল ভাজা। তারপর ঘটেছে নানা ভয়ঙ্কর ঘটনা, অবশেষে এসেছে সেই অলৌকিক ক্ষণটি। সন্তানের সাধনায় তুষ্ট হয়ে জগৎজননী সন্তান সাধককে দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন।

আর সেইজন্যই পরলোকতত্ত্বে ষোড়শীকান্তের ছিল অসম্ভব বিশ্বাস। আর জামাতার ছিল দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা সম্পর্কে প্রবল জিজ্ঞাসা। শেষপর্যন্ত এই একটি কারণেই দুই অসমবয়সি মানুষ একজায়গায় এসে একত্রিত হলেন। গড়ে উঠল সুন্দর এক পারিবারিক সম্পর্ক। এরপর আর কোনও 'কিন্তু' বা 'বাধা' রইল না।

কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো তান্ত্রিক ছিলেন না! তাহলে তিনি কেন আকৃষ্ট হলেন এই অলৌকিক জগতের প্রতি! দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা কেন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল! এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদের একবার কিছুক্ষণের জন্য ফিরতে হবে আরও একটু অতীতে—রিপন কলেজের (অধুনা যে কলেজটি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত) সেইসব দিনগুলিতে। বিভূতিভূষণ তখন কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তাঁর সঙ্গে হঠাৎই বিয়ে হল বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামের জমিদার ও

মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা গৌরীদেবীর। দিনটি ছিল বত্রিশে শ্রাবণ, তেরেশো চব্বিশ সন, ইংরেজি উনিশশো সতেরো সাল।

এই দাম্পত্য জীবন কিন্তু মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ঠিক ষোলো মাসের মাথায় পুজোর পরপরই একই দিনে আগে মা কামিনীদেবী এবং তার কিছুক্ষণ পরেই চলে গেলেন মেয়ে গৌরীদেবী। মহামারীর আকারে সেবার বাংলায় প্রবেশ করেছিল ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এক জ্বর। সেই জ্বরে কিছুক্ষণের তফাতে একই পরিবার থেকে অকালে ঝরে গেল দুটি প্রাণ।

শ্বশুরবাড়ি পানিতর থেকে শ্বশুরমশাই কালীভূষণ তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন জামাইয়ের কাছে। খবর পেয়ে বিভূতিভূষণও রওনা হয়েছিলেন পানিতরের পথে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন পাশাপাশি মায়ের কোলের কাছে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছেন তাঁর কিশোরী বধু গৌরী, পরনে রয়েছে পুজোর আগে তাঁরই দেওয়া আটপৌরে শাড়িটি। বিভূতিভূষণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি ক্রমশ ডুবতে শুরু করলেন শোকের অতল গহ্বরে। পড়াশুনা মাথায় উঠল। দিন রাত তিনি ঘুরে বেড়ান পথে পথে। এমনই এক দিনে তিনি খবর পেলেন তাঁর ছোট বোন মণিও সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। আঘাতের পর আঘাত। শোকে বিদীর্ণ হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ।

এমনিই কঠোর কঠিন সময়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল এক সাধকের। বিভূতিভূষণ সেদিন উদভ্রান্তের মতো টালিগঞ্জের খালটা পার হয়ে হেঁটে চলেছেন পুঁটিয়ারির দিকে। হঠাৎই তিনি দেখতে পেলেন সেই জটাজুটধারী সৌম্য সন্ন্যাসীকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। মন হয়তো বলেছিল, যাও ওই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করো, ওখানেই পেতে পারো একটু শান্তি।

বিভূতিভূষণ মনের কথা শুনে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের সামনে বসে পড়লেন। সৌম্য সন্ন্যাসী তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, বেটা, মনে বড় কষ্ট তাই না!

বিভূতিভূষণ মাথা নাড়লেন।

সন্ন্যাসী বললেন, তোর বউ ক'দিন আগেই তো মারা গিয়েছে। তাকে তোর খুব দেখতে ইচ্ছা করে! তাকে দেখবি?

বিভূতিভূষণ বললেন, বাবা, আমি কি তাকে সত্যি দেখতে পাব?

সন্ন্যাসী বললেন, গীতা পড়িসনি! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন আত্মা অবিনশ্বর।

বিভূতিভূষণ যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি বললেন, বাবা, আমার বউকে আমি দেখতে চাই। কিন্তু কীভাবে দেখব!

সন্ন্যাসী বললেন, কেন প্ল্যানচেটে।

পরপর কয়েকদিন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বিভূতিভূষণ শিখে নিলেন প্ল্যানচেটের গূঢ় তত্ত্ব।

তারপর শুরু হল তাঁর চক্রাধিবেশন। অনেকগুলো দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি মেতে রইলেন পরলোকে হারিয়ে যাওয়া তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে।

মানসিক দিক থেকে তখন অনেকটাই শান্ত বিভূতিভূষণ। একদিন তিনি সেই সন্ন্যাসীর খোঁজে আবার গেলেন পুঁটিয়ারি। কিন্তু কোথায় সেই সন্ন্যাসী। তাঁর শূন্য আস্তানায় খালি পড়ে আছে সন্ন্যাসীর অব্যবহৃত কিছু সামগ্রী। বিভূতিভূষণ আশেপাশে অনেকের কাছেই সেই সন্ন্যাসীর সন্ধান করলেন। অনেকেই বললেন, তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। নিজ আস্তানায় ফিরে এলেন হতাশ বিভূতিভূষণ। তারপর তাঁর আর বোধহয় সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি বোধহয় অশান্ত বিভূতিভূষণকে শান্ত করে বেরিয়ে পড়েছিলেন আরও কোনও অশান্ত মানুষের সন্ধানে। কারণ তাঁর হাতেই তো রয়েছে শান্তির বারিধারা।

কেন দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই কারণটা আমরা জানতে পারলাম। তাহলে আবার আমরা ফিরে যাই অসমবয়সি দুই মানুষ, ষোড়শীকান্ত ও বিভূতিভূষণের সেই আসরে।

মাননীয় কিশলয় ঠাকুর 'পথের কবি' গ্রন্থের একজায়গায় লিখছেন, 'প্রেততত্ত্ব নিয়ে এক-একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা। মাঝে মাঝে চক্রাধিবেশন। দুজনেই মেতে উঠলেন নতুন উৎসাহে। গড়গড়ার নল সমানে চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে করে হাতে হাতে ঘুরে আসর জমাটি।'

তখনও চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে কেউ-ই কাউকে চিনতেন না। কিন্তু ললাট-এর লিখন বড়ই রহস্যময়। একসময় যাঁর অধীনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করেছেন, সেই খেলাত ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর কাছারির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন ষোড়শীকান্তের শ্বশুরমশাই সারদাকান্ত চক্রবর্তী, আরণ্যকের সারদাকান্ত। অবসর সময়ে সারদাকান্ত বিভূতিভূষণকে শোনাতেন তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এই গল্প করতে করতে সারদাবাবু বিভূতিভূষণকে শুনিয়েছিলেন তাঁর তন্ত্রসাধক জামাতার জীবন ও তন্ত্রসাধনার কথা। গল্প শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। অচেনা, অদেখা সেই তন্ত্রসাধক মানুষটি সম্পর্কে তিনি আরও অনেক কথা জানতে চাইতেন চক্রবর্তীমশাইয়ের কাছে। সারদাকান্তও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাই অধীনস্থ হলেও তিনি মেনে নিতেন বিভূতিভূষণের সমস্ত আবদার। প্রায়ই শোনাতেন তাঁর জামাতার কাহিনি।

লেখক বিভূতিভূষণ বড় হয়েছেন প্রকৃতির কোলে, লিখতেন প্রকৃতির গন্ধ মাখা মিষ্টি লেখা। সেই অসামান্য কথাসাহিত্যিক একদিন হবু দাদা শ্বশুরের মুখে ভাবী শ্বশুরের কাহিনি শুনে 'তারানাথ তান্ত্রিক'-কে নিয়ে লিখে ফেললেন দুটি গল্প। কিন্তু তারপর তাঁর কলম আর কখনও এই তান্ত্রিককে চরিত্র করে কোনও গল্প লেখেনি। আসলে তাঁর জীবনটাও ছিল বড়ই সংক্ষিপ্ত। তিনিও আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো নিজের মৃতদেহ দর্শন করেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মৃতদেহ দেখেছিলেন নিদ্রিত অবস্থায়। আর বিভূতিভূষণ সজ্ঞানে, এঁদেলবেড়া হ্রদের কাছে।



ইছামতী নদীতে সাঁতার কাটতে তিনি বড়ই ভালোবাসতেন। বলতেন, ইছামতী আমাকে উজাড় করে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু সেই ইছামতীর কাছ থেকেই তিনি পেলেন প্রবল আঘাত। ওই নদীর কোলে চিরতরে হারিয়ে গেলেন তাঁর ছোট বোন, তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা বন্ধন, জাহ্নবী, যাঁকে তিনি আদর করে জাফরি নামে ডাকতেন।

তিনি তখন কলকাতার মেসে থাকেন। ভগ্নীপতি পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর বোন জাহ্নবীর জীবনটা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কৃপায় হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। বোনের এই নিদারুণ যাতনা বিভূতিভূষণ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বোনকে বললেন, আর কত লাঞ্ছনা তুই মুখ বুঝে সহ্য করবি। তুই চল আমার সঙ্গে। পিতৃসম বড় দাদার অনুরোধে পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে জাহ্নবীদেবী চলে এলেন বড়ভাইয়ের আশ্রয়ে। বিভূতিভূষণ বনগাঁ ডাকবাংলোর পাশে বারো টাকা দিয়ে দু'কামরার একটা ঘর ভাড়া নিলেন। জমে উঠল ভাই-বোনের সংসার।

কিন্তু সুখ দীর্ঘস্থায়ী নয়। পঞ্চাননবাবু মারা যাওয়ার আগে জাহ্নবীদেবী এক কন্যা সন্তানের মাতা হন। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর দায় বহন করতে হয়েছিল সদ্যোজাত সেই কন্যা সন্তানকে। তাকে চট পেতে শুইয়ে রাখা হতো বাড়ির বাইরের নারকেল গাছের তলায়। স্বভাব কবি বিভূতিভূষণকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এই দৃশ্য। তিনি তাঁর দিনলিপির পাতায় নিজের অশ্রুজল দিয়ে লিখলেন সেই কাহিনি, 'ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত আহা কি হাসি, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে? ওর অপরাধ ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যি ওর হাসি কেউ চাইতো না। ওর বাবা তো মারা গেল, ওর মার সংকটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না। ওর খুড়িমা বললে, টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দিই। ওকে নারকেল

তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে। আনওয়ানটেড স্মাইল। কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেছি। এছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ও। পুওর লিটল মাইট। কিন্তু আমি বলি এ হাসি শাশ্বত।'

ইছামতীর কোলে জাফরি চিরআশ্রয় নিলেও এরপর বনগাঁ বিভূতিভূষণকে দিল দু'হাত ভরে। সার্কেল ইনস্পেক্টর হয়ে এই শহরে এলেন ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। আর এই মানুষটির পরিবারের ভালোবাসার বন্ধনে এবার আবদ্ধ হবেন স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

'পথের পাঁচালী' ততদিনে লিখে ফেলেছেন বিভূতিভূষণ। আর সেই লেখা পাঠকের মনে তুলেছে প্রবল আলোড়ন এবং সেই লেখা পড়ে আপ্লুত হয়েছিলেন তন্ত্রসাধক ষোড়শীকান্তের মেজ কন্যা কল্যাণীদেবী। আদর করে তাঁর পিতা তাঁকে রমা নামে ডাকতেন। অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকুরণ-হরিহরের স্রষ্টা তাঁদের বাড়ির এত কাছে থাকেন শুনে তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

খবরটা তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর পিসিমা নির্মলাদেবী। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, ইস, মা-টা চলে গেল ইছামতীর বুকে। কী খারাপ খবর। এখন ওই ছোট ছোট দুটো শিশুকে ওই চালচুলোহীন মানুষটা একলা কী করে সামলাবেন!

কল্যাণীদেবী পিসির কথা শুনে ভেবেছিলেন মানুষটি বোধহয় সংসার বৈরাগী সন্ন্যাসী গোছের কোনও লোক। তিনি পিসির কাছে জানতে চাইলেন, লোকটা কি সন্ন্যাসী?

পিসি বললেন, সন্ন্যাসী হতে যাবেন কেন! বহুদিন আগে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন। জীবনের অন্যতম বন্ধন ছোটবোনটিও চলে গেল! বউ নেই তো, তাই তাঁর সংসারও নেই!

কল্যাণীদেবী বললেন, তুমি তাঁকে চেনো?

পিসি বললেন, আমি কেন, তুইও চিনিস। কত গল্প, নভেল তিনি লিখেছেন। এই তো ক'দিন আগেই তুই তাঁর লেখা পথের পাঁচালী পড়ছিলিস।

কল্যাণীদেবী বললেন, তাই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়! তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে!

পিসি বললেন, নিয়ে যাব, তবে মানুষটাকে একটু সামলাতে দে। শোকটা একটু কমুক। তারপর নিয়ে যাব তোকে। কল্যাণীদেবীও তখন অল্পবিস্তর সাহিত্যচর্চা করেন। তিনি পিসিকে চেপে ধরলেন তাঁর স্বপ্নের লেখক বিভূতিভূষণকে সামনাসামনি দর্শন করার জন্য।

সেইসময় ঈশ্বরের অবিরাম কষাঘাতে জর্জরিত বিভূতিভূষণ। অসহায়, অনাথ দুই ভাগ্নে ও ভাগ্নীকে বুকে চেপে দিন কাটছে তাঁর প্রাণপ্রিয় বনগাঁ শহরে।

আর ঠিক সেই ক্ষণে তাঁর জীবনে এলেন ষোড়শীকান্তের মেজ কন্যা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। সেদিন ছিল পাঁচই অগ্রহায়ণ। বিভূতিভূষণের বাড়ির দরজার কড়া নাড়লেন নির্মলাদেবী, সঙ্গে ষোলো বছরের ভাইঝি কল্যাণী।

দরজা খুলে দিল সদ্য মাতৃহারা সেই ছোট্ট মেয়েটি।

নির্মলাদেবী জানতে চাইলেন, বিভূতিভূষণবাবু বাড়িতে আছেন?

শোকে আচ্ছন্ন সেই মেয়েটি বলল, বড়মামা বাড়িতে আছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন নির্মলাদেবী। তিনি বললেন, আজ এইসময় আমাদের এখানে আসাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। আমি আপনার মনের অবস্থার কথা জানি। কিন্তু আসতে বাধ্য হলাম আমার এই ভাইঝির জন্য। ও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত।

বিভূতিভূষণ খুব মৃদু স্বরে বললেন, ভালোই করেছেন আজ এসে। বনগাঁর পাট আমার চিরতরে চুকল বোধহয়! এদের দুজনকে পাঠিয়ে দেব ঘাটশিলায় আমার ভাইয়ের কাছে। তারপর আবার ভেসে পড়ব এই

পৃথিবীর বুকে।

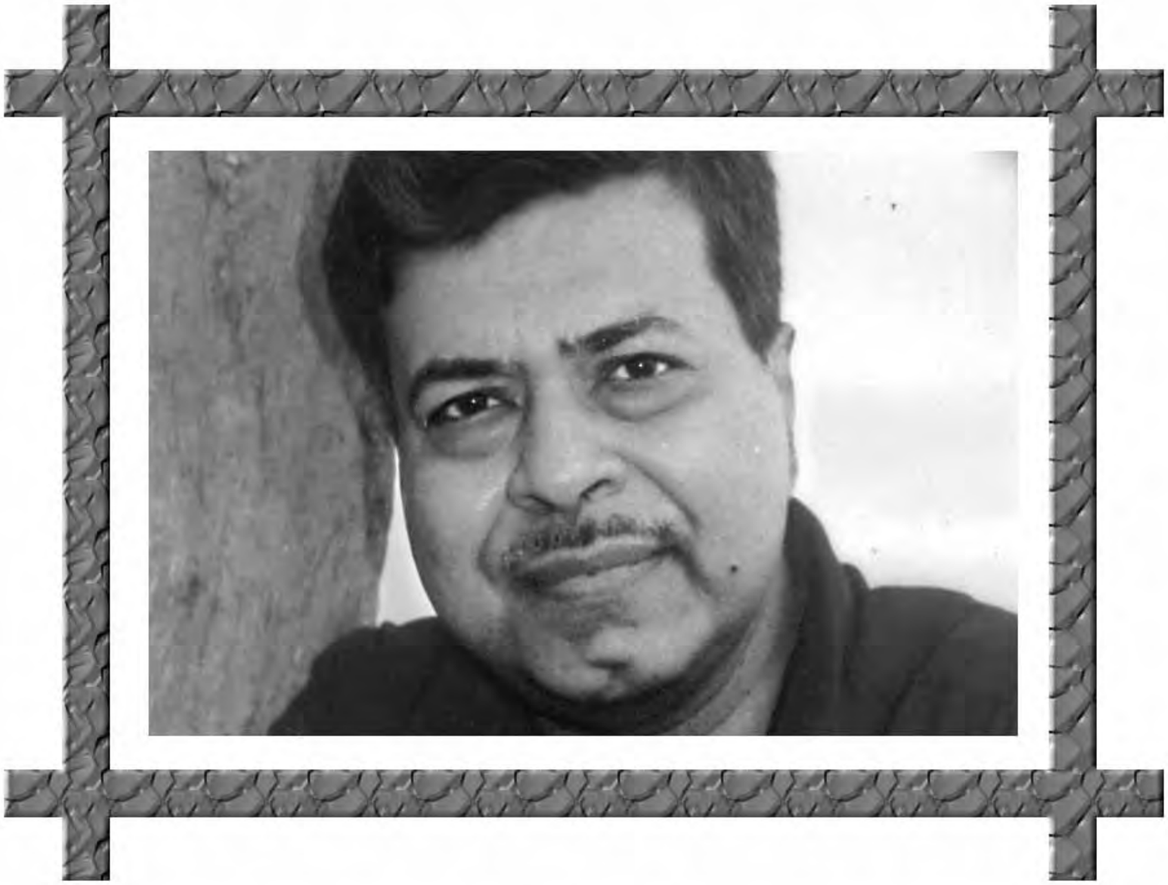
নির্মলাদবী বললেন, সে কী! কেন? এই শহরকে আপনি কত ভালোবাসেন।

কিশলয় ঠাকুর তাঁর 'কালের কবি' গ্রন্থে লিখছেন, বিভূতিভূষণ বললেন, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। এই বনগাঁ, বারাকপুরকে আমি যে কত ভালবাসি, সে কথা কেউ জানে না। কেউ নেই আমার বারাকপুরে। তবু ছিল জাহ্নবী, তখন চালকিতে, তার পরে এখানে। একমাত্র অবশিষ্ট বোন আমার, তাকেও হারালাম ওই ইছামতীতে।'

সময়ও বোধহয় তখন স্তব্ধ হয়ে শুনছেন বিভূতিভূষণের সেই আর্তনাদ। সেইসময় মামার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সদ্য মাতৃহারা দুই বালক-বালিকা।

এর বেশকিছু বছর বাদে ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনাটি। কল্যাণীদেবীর সঙ্গে এবার বিবাহ হবে বিভূতিভূষণের। আবার নতুন করে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তিনি। তবে তিনি পুনরায় বিবাহে রাজি ছিলেন না। তুলেছিলেন বয়েসের অজুহাত। কল্যাণীদেবী ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন হবু স্বামীর সেই ঠুনকো অজুহাত। তিনি সেদিন প্রণাম করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে। আর বিভূতিভূষণ! বাড়ি ফিরেই বসেছিলেন প্ল্যানচেটে। এসেছিলেন তাঁর মা মৃণালিনীদেবী। বিবাহের অনুমতি চেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। মা সানন্দে অনুমতি দিলেন।

মায়ের অনুমতি পেয়ে আবার মাথায় টোপর পরলেন বিভূতিভূষণ। আর সেই মাসটাও ছিল অগ্রহায়ণ, তারিখটি ছিল সতেরো। কল্যাণীদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল এমনই এক অগ্রহায়ণ মাসে।



সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। জমে উঠল বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির সুখের সংসার। আর সেই দৃশ্য দেখে বিধাতা বোধহয় একটু মুচকি হেসেছিলেন, হয়তো মনে মনে বলেছিলেন, বিভূতিভূষণ, সুখ নয়, তোমাকে আমি পৃথিবীতে পাঠিয়েছি সৃষ্টি করার জন্য, সুখভোগের অধিকারী তুমি নও! তুমি আমৃত্যু দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত থেকে সৃষ্টি করবে কালজয়ী রচনা। তোমাকে পৃথিবী মনে রাখবে তোমার সৃষ্টির জন্য।

আবার এল আঘাত। সেই আঘাতে এবার স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীর্ণ হলেন। তবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী সেই অসম্ভব শোককে চেপে রাখলেন নিজের বিশাল হৃদয়ে। কিন্তু স্ত্রী! শোকে তিনি মগ্ন হলেন। কল্যাণীদেবী তখন সন্তান সম্ভবা। পরবর্তীকালে রমা (কল্যাণী) বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভয়ঙ্কর দিনটির বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'কাছে থেকে দেখা' গ্রন্থে। তিনি লিখছেন, 'ধাত্রী মাসিমা প্রত্যহই এসে একবার দুবার আমাকে দেখে যেতেন কিন্তু পালে বাঘ পড়ার দিন হল অন্য ব্যাপার।

সেদিন সকালবেলা থেকে হঠাৎ আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। মাসিমা ধাত্রী মাসিমার কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু মাসিমা এলেন না আবার জোর তলব পাঠান হল। মাসিমা আমাকে ধরে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।...আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হল। ডাক্তারবাবু, মাসিমা আর ধাত্রী মাসিমার কথাবার্তায় বুঝলুম যে সন্তান জন্ম নিল আমার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে—সে মৃত।

আমি অবুঝের মতো কেঁদে উঠলাম—ডাক্তারবাবু, আপনারা তো কত কায়দা জানেন। আমার খুকীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু! ঠান্ডা জল গরম জলে ডোবান ওকে। আমার মনকে বোঝাবার জন্য ওঁরা সবই করলেন। কিন্তু বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছিল আমার দেহের ভেতরেই। কয়েক ঘণ্টা আগেই।'

বাচ্চাটি মারা যাওয়ার পরের দিন রাত্রেই বিভূতিভূষণ স্ত্রীকে লাইব্রেরি থেকে দু'খানি বই এনে দিয়েছিলেন। সেই দিনের কথা পরবর্তীকালে স্মরণ করেছেন রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন, 'খুকীটি মারা যাবার পরের দিন রাত্রিতেই উনি দুখানা বই এনে দিয়েছিলেন লাইব্রেরি থেকে, আজও মনে আছে। তার মধ্যে একখানা 'And Quiet Flows the Don'-এর অনুবাদ। খুব ভালো লেগেছিল বইখানা। আমার মনের গভীর বেদনার দিনের সঙ্গী হয়েছিল ওই বইখানি। আজও যখনি বইখানি হাতে পড়ে, তখনি মনে পড়ে সেই বেদনায় নীল দিনগুলির কথা। মাথাধরা নিয়েই ভুলে থাকবার জন্য বই পড়ে যেতাম। বহু চিকিৎসায় ছ-সাতদিন বাদে মাথার যন্ত্রণা কমে।'

দুই

মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি মৃত্যুকে বলতেন মানবজীবনের একটা রূপান্তর। মানুষের মৃত্যুর পরের জগৎ আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। তাই বলে একথা ঠিক নয় যে, মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়।

বিভূতিভূষণ ও রমাদেবীর সন্তান বাবলু (তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন খুব ছোট। সেইসময় তিনি মারাত্মক টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। তাঁর জ্বর কিছুতেই কমছে না। পালা করে স্বামী-স্ত্রী ছেলের পাশে বসে থাকতেন। একদিন কল্যাণীদেবী স্বামীকে ছেলের পাশে বসিয়ে স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান সেরে ফিরে আসার পর তাঁর বাড়ির পরিবেশটা কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বাবলুর কিছু হয়েছে। রমা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম উনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন বাবলুর শিয়রের পাশে। তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টিতে। কেমন যেন শক্তিহীন, বিবর্ণ মানুষ।...কোন সুদূর থেকে যেন উনি ক্ষীণ গলায় কথা বলছেন—জানো কল্যাণী, তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি একটা কাণ্ড করেছি।

আমি অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। উনি বললেন—আমি নির্দেশ পেলাম, বাবলুর এ অসুখের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হলে আমার আয়ু বাবলুকে দান করতে হবে। কে যেন আমাকে বলছে—তুমি পারবে তোমার আয়ু দান করতে? তাহলে বাবলু নীরোগ হয়ে দীর্ঘজীবী হবে—

অবাক হয়ে আমি বললাম—তুমি কী করলে?





উনি বললেন—আমি মনে মনে বললাম—'বাবলু আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। বলুন কি করতে হবে? আমার আয়ু দিয়ে যদি আমার বাবলু ভালো হয়ে ওঠে তাহলে আমি তাই করব এখুনি।

নির্দেশ পেলাম—তোমার দুই পা তোমার ছেলের মাথার ওপর রেখে একমনে প্রার্থনা কর যে, তোমার আয়ু সবটুকু ওকে তুমি দান করলে।

আমি তাই করলাম। দুই পা বাবলুর মাথায় ছুঁইয়ে বললাম—আমার সবটুকু আয়ু আমি ছেলেকে দিয়ে দিলাম। এই আয়ুর বদলে ওকে তুমি দীর্ঘজীবী কর ঈশ্বর।...এরপরে উনি কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। বড়জোর মাস আটেক কি বছর খানেক।'

এর কিছুদিন বাদেই ঘাটশিলার এঁদেলবেড়া হ্রদের কাছে কয়েকজন বন্ধু মিলে বিভূতিভূষণ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে সকলে দেখেন বনের গভীরে একটা আলো জ্বলছে। সবাই মিলে ঠিক করলেন, ওখানে তো কোনও লোকবসতি নেই তাহলে কীসের আলো?

অন্যরা বারণ করা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ সেই আলোর সন্ধানে একাই চলে গিয়েছিলেন।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'উনি এগিয়ে গিয়ে কি দেখে নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন জোরে। আর্তরব উঠেছিল ওঁর মুখ থেকে।

সেই চিৎকার শুনে দু-চারজন এগিয়ে গিয়ে দেখেন ওখানে একটি পরিষ্কার জায়গায় একটি কলসী। পাশেই খাটিয়ায় একটি মৃতদেহ আর দাহকার্যের নানাবিধ উপাচার। প্রদীপ জ্বলছে। মৃতদেহের মুখের কাপড় সরে

গিয়েছিল। তাই দেখে উনি চীৎকার করে উঠেছিলেন। কার মুখ দেখেছিলেন উনি সেই মৃতদেহের মুখের কাপড় সরে গেলে? নিজের? সেইরকমই আভাস দিয়েছিলেন বন্ধুদের। (নিজের প্রতিরূপ বা দ্বিতীয় সত্তা দেখতে পাওয়ার ঘটনা বিরল হলেও ইতিহাসে প্রাপ্তব্য। কবি গ্যোটে নিজের অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। জার্মান ভাষায় একে বলে Doppelganger। কথিত আছে মহাপুরুষদেরই কেবল এমন হয় এবং এরূপ দর্শনের পর তাঁরা বেশিদিন জীবিত থাকেন না।)'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি যেদিন চিরতরে চলে গেলেন সেই দিনটি ছিল তেরশো সাতান্ন সালের পনেরোই কার্তিক, বুধবার। সময় রাত আটটা পনেরো মিনিট।



ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এক নতুন যুগের। জন্ম হল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের। সম্পর্কে তিনি ছিলেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা। তিনি তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন ভাগলপুরে। তাঁর যখন বারো বছর বয়েস সেইসময় তাঁর প্রথম পদ্য 'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয় 'সখা ও সাথী' নামে এক মাসিক পত্রিকায়। সেই প্রথম পদ্যই তৎকালীন গুণীজনদের প্রশংসা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। অত্যন্ত সাহসী এই মানুষটির পরলোক, প্রেতাত্মা ইত্যাদি ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কোনও আড্ডায় এই ধরনের কোনও প্রসঙ্গ উঠলে তিনি হো-হো করে হেসে বক্তাকে অপ্রস্তুত করে প্রায় থামিয়ে দিতেন।

এইরকম ভূত-অবিশ্বাসী মানুষটিও একদিন তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯০২ সালের কথা, সেইসময় তিনি সপরিবারে ভাগলপুর থেকে চলে এসেছেন ভবানীপুরের কাঁসারিপাড়া রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে।

মাসটা ভাদ্র, উপেন্দ্রনাথের মা বাড়িতে উদযাপন করবেন তালনবমী ব্রত। সেই উপলক্ষে বাড়িতে বেশ কয়েকজন অতিথি এসেছেন। তাঁরা রাতের আহার করেই বাড়ি ফিরবেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উপেনবাবুর অত্যন্ত পরিচিত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথবাবু নাকুবাবু নামেই বন্ধু মহলে বেশি পরিচিত ছিলেন।

কাঁসারিপাড়ার বাড়ির বৈঠকখানায় তখন আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎই নাকুবাবু বললেন, উপেনবাবু আপনার এই বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে।

তাঁর কথা শুনে উপেনবাবু সহ সবাই হইহই করে হেসে উঠলেন।

তাঁদের বিদ্রূপাত্মক হাসিতে একটু আহতই হলেন নাকুবাবু, তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এখন হাসছেন হাসুন! কিন্তু সেই ভূত যখন আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন আপনাদের মুখ থেকে আর কোনও কথা বেরোবে না।

অতিথিদের মধ্যে একজন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কী করে জানলেন এ বাড়িতে ভূত আছে?

নাকুবাবু বললেন, একমাস-দু'মাস নয় এই বাড়িতে আমরা বছর খানেক কাটিয়ে গিয়েছি। এখানে আমরা ভাড়া থাকতাম। আমি নিজের চোখে সেই ঘটনা দেখেছি।

উৎসাহী এক অতিথি জানতে চাইলেন আপনি কী দেখেছিলেন বলুন না আমাদের?

নাকুবাবু গুছিয়ে বসে গল্প শুরু করলেন। বললেন, শুনুন তাহলে! আমাদের আগে এই বাড়িতে যাঁরা ভাড়া থাকতেন, তাঁদের বছর চারেকের একটি ছেলে ছিল। সারাটা দিন সে মার্বেলের গুলি নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় খেলে বেড়াত, কখনও কখনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও সে তার ঘরের মেঝেতে মার্বেল গড়িয়ে দিত। সেই ছেলেটি মারাত্মক কলেরায় হঠাৎ-ই একদিন মারা গেল। আমরা যে ঘরে বসে এখন গল্প করছি এর ওপরের ঘরটাতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেটি থাকত। ওই ঘরেই সে মারা যায়। তারপর থেকে প্রতিদিন রাত একটার সময় ছেলেটি ওই ঘরে একবার করে মার্বেল ছড়িয়ে দেয়। শান্ত রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে সেই মার্বেল ঠক ঠক করে গড়িয়ে যায় ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথায়। আর সেই শব্দে অতি সাহসী মানুষেরও মশাই বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে ভিতর বাড়ি থেকে অতিথিদের খেতে যাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছেন উপেন্দ্রনাথবাবুর ভাগ্নে সুশীলচন্দ্র। রাত তখন সাড়ে দশটা। আড্ডা ভেঙে গেল, সবাই রওনা হলেন রাতের আহার সারতে।

খাওয়া সেরে যখন প্রায় সব নিমন্ত্রিতই বিদায় নিয়েছেন ঠিক সেইসময় উপেন্দ্রনাথ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, এখন তো প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আর ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করলেই আমরা শুনতে পাব বালক ভূতের মার্বেলের শব্দ। আজ তুমি রাতটা এখানেই থেকে যাও। আজকেই প্রমাণ হয়ে যাবে সত্যি ভূত আছে কি নেই!

শ্যামরতনবাবু বললেন, আমি তোমাদের এখানে থেকে যেতেই পারি, তবে আমাকে একবার বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে হবে।



কিছুক্ষণের মধ্যে শ্যামরতনবাবু ফিরে এলেন বাড়ি থেকে। বৈঠকখানার ঘরের আরামকেদারায় তখন নিজের শরীর মেলে দিয়েছেন পরিশ্রান্ত সুশীলচন্দ্র। তাঁদের জন্য তৈরি করা বিছানায় দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই বালক ভূতের মার্বেল গড়ানোর শব্দ শোনার জন্য।

বাড়ির সবাই তখন যে যাঁর ঘরে শুয়ে পড়েছেন। ঢং করে একবার শব্দ করে দেওয়াল ঘড়ি জানিয়ে দিল সময় আসন্ন। দুই বন্ধুই বিছানার ওপর উঠে বসলেন। আর ঠিক তখনই ওপরের ঘরের মেঝেতে ঠক ঠক

ঠক ঠক করে মার্বেল গড়ানো শুরু হল। সেই আওয়াজে দুই বন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। উপেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। তিনি চাইছিলেন নিজের চোখে পুরো ঘটনাটি দেখতে। শ্যামবাবু বন্ধুর ডান হাতের কনুইয়ের কাছটা চেপে ধরে বললেন, এতরাতে সাহস দেখিয়ে আর কাজ নেই। চলো, শুয়ে পড়া যাক। বন্ধুর কথায় উপেনবাবু শুতে চললেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই উপেন্দ্রনাথ তাঁর দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে রাতের পুরো ঘটনাটি বললেন। তিনি সব শুনে বললেন, এটা নিয়ে অহেতুক চিন্তা করার কিছু নেই। তবে, একটা কথা মাথায় রেখো, বাড়ির মেয়েরা যেন এই ব্যাপারটা জানতে না পারে। তাহলে অহেতুক ভয় পাবে।

এই ঘটনাটি ঘটার দিন কয়েক পরে শ্বশুরবাড়িতে এলেন লালমোহনবাবুর দ্বিতীয় জামাতা সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনিই হবেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সেদিন রাত একটা নাগাদ তাঁর দরজার সামনে মার্বেল গড়ানোর শব্দ পেয়ে তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, তাঁর ঘরের দরজার সামনে একটা ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সুবোধবাবু তাকে চিনতে পারলেন না। তিনি বাচ্ছাটির কাছে জানতে চাইলেন, তুই কে? এত রাতে এখানে কী করছিস?

প্রশ্ন শুনেই বারান্দার সামনে ঘন গাছটির মধ্যে ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। শিউরে উঠলেন সুবোধচন্দ্র। ইষ্টনাম জপতে জপতে তিনি তড়িঘড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। সেই রাতে তিনি দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারেননি।

পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, 'সুবোধের অভিজ্ঞতা ও আমাদের অভিজ্ঞতার দুটি গল্পকে স্বতন্ত্রভাবে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ, একত্রে তত সহজ নয়। দুটি গল্পকে সংযুক্ত করে দেখলে মনে হয়, উভয়ের সমষ্টি থেকে কোনও এক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।'



উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরে চুটিয়ে ওকালতি করেন। সারাদিনের কাজকর্মের শেষে তাঁর বাড়িতে সন্ধের পর বসত জমিয়ে আড্ডা। শহরের বিখ্যাত গুণীজনদের পাশাপাশি আসতেন অখ্যাতরাও। বিখ্যাতদের মধ্যে আসতেন অমরেন্দ্রনাথ দাস, মণিবাবু, প্রেমসুন্দর বসু, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন সহ আরও অনেকে।

ফরাসের ওপর গোল হয়ে বসে গান-বাজনা-গল্পে কেটে যেত তাঁদের সময়। শুধুমাত্র বেতের ইজিচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসতেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। পায়ের একটা অপারেশনের কারণে তিনি মাটিতে পা মুড়ে বসতে পারতেন না। সেই কারণে ওই বেতের ইজিচেয়ারটি তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট থাকত। তিনি আড্ডায় কোনওদিন যদি অনুপস্থিত থাকতেন তাহলেও ওই চেয়ারে কেউ গিয়ে বসতেন না।

ভাগ্নে শরৎচন্দ্রের মতোই চমৎকার গান গাইতে পারতেন উপেন্দ্রনাথ। ওই রাতের আড্ডার প্রধান ও মূল আকর্ষণ ছিল তাঁর গান। এই আড্ডাঘরের খুব সুন্দর বিবরণ পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে লিখে রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখছেন, 'অমরেন্দ্র ও আমি সামনাসামনি বসি, মধ্যে পড়ে থাকে একটি হারমোনিয়ামের ব্যবধান। একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আমরা সকলেই ফরাসে বসি। কিছুকাল পূর্বে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় তিনি পা মুড়ে বসতে পারেন না। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বেতের ইজিচেয়ার ছিল, প্রতিদিন সঙ্গীতপ্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র একটি পায়ের ওপর অপর পা স্থাপন করে সেই চেয়ারে উপবেশন করে গান শোনেন, আলাপ-আলোচনা করেন। চেয়ারটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এমন কি তিনি উপস্থিত না থাকলেও কেউ সেটা অধিকার করে না, তাঁর অপেক্ষায় খালি পড়ে থাকে।'

একদিন সন্ধেবেলায় ক্ষিতীশচন্দ্র সেন হন্তদন্ত হয়ে আড্ডাঘরে ঢুকে সরাসরি উপেনবাবুর মুখোমুখি হয়ে বললেন, মশাই কাল সারা রাত আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

উপেনবাবু তাঁর কাছে কারণটা জানতে চাইলেন।

ক্ষিতীশবাবু বললেন রবিবাবুর একটা গান আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল মশাই! তারপর তিনি উপেনবাবুর হাতে একটা বই তুলে দিয়ে বললেন, অমুক পাতাটা খুলে গানটা পড়ুন। জোরে জোরে পড়বেন।

হাকিমের হুকুম অমান্য তো করা যায় না। তিনি পড়লেন—

'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান।।
ভুলবে সে গান যদি নাহয় যেও ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগরকূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান।।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।।'

উপেনবাবুর পড়া শেষ হওয়া মাত্র ক্ষিতীশবাবু বললেন, আপনাকে আমি শুধু শুধু পড়ার জন্য গানটা পড়তে বলিনি। এই গানটি আপনি আমাকে গেয়ে শোনাবেন।

উপেনবাবু বললেন, আজকেই তো সেটা সম্ভব হবে না! আমাকে দুদিন সময় দিতে হবে। স্বরলিপি দেখে, গানটা তুলে অবশ্যই আপনাকে শোনাব। আপনার হুকুম অমান্য করব এমন সাধ্য আমার কোথায়!

ক্ষিতীশবাবু বললেন, রসিকতা করবেন না। পরশুদিনই আমি গানটা আপনার কণ্ঠে শুনব।

সেদিনের মতো ব্যাপারটা মিটে গেল। গানে, গল্পে, হাস্যকলরবে আবার মুখর হল আড্ডাঘর। কিন্তু বেজায় চিন্তায় পড়লেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ হাতে মাত্র আর একটা দিন সময়। তার মধ্যেই স্বরলিপি জোগাড় করে গানটা তাঁকে তুলতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে ক্ষিতীশবাবু আড্ডাঘরে ঢুকেই পাকড়াও করলেন উপেনবাবুকে। জানতে চাইলেন, আজকে গানটা শোনাবেন তো?

উপেনবাবু বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি গানটা তুলে ফেলেছি। তবে একটু অপেক্ষা করুন, সবাই আসুক, তারপর আমি গান শোনাব।

সবাই আসার পর ক্ষিতীশচন্দ্রের প্রিয় গানটি উদাত্ত গলায় গাইলেন উপেনবাবু।

গান গাইতে গাইতে হঠাৎই উপেনবাবু ক্ষিতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক অঝোরে কাঁদছেন। দু'চোখের জল গাল ছাপিয়ে যেন আছড়ে পড়ছে মানুষটির বুকে। গান থামিয়ে উপেনবাবু জানতে চাইলেন, ক্ষিতীশবাবু, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে!

তিনি বললেন, না, শরীর আমার ঠিকই আছে। আমি আবেগে কাঁদছিলাম। আপনি আর একবার গানটা করুন।

সেদিনের পর থেকে প্রতিদিনের আড্ডায় নিয়ম করে এই গানটি উপেনবাবুকে গাইতে হতো। এইভাবে মাসখানেক চলার পর হঠাৎ-ই একদিন আড্ডায় এলেন না ক্ষিতীশচন্দ্র। খবর পাওয়া গেল তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সবাই মিলে দেখতে গেলেন তাঁকে। সেখানে গিয়ে জানা গেল ঘোড়ার গাড়ি থেকে

পড়ে গিয়ে মাথায় তাঁর চোট লেগেছে। সেই মাথার আঘাতে সারা মুখ জুড়ে বিসর্প রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তার-কবিরাজের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না ক্ষিতীশচন্দ্রকে।

ভাই মারা গিয়েছেন খবর পেয়ে দেশের বাড়ি মজফরপুর থেকে ছুটে এলেন তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথ সেন। পারলৌকিক কাজ সেখানেই হবে। তাই তিনি ভ্রাতৃবধূ সহ ভাইপো-ভাইঝিদের দেশের বাড়িতেই নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

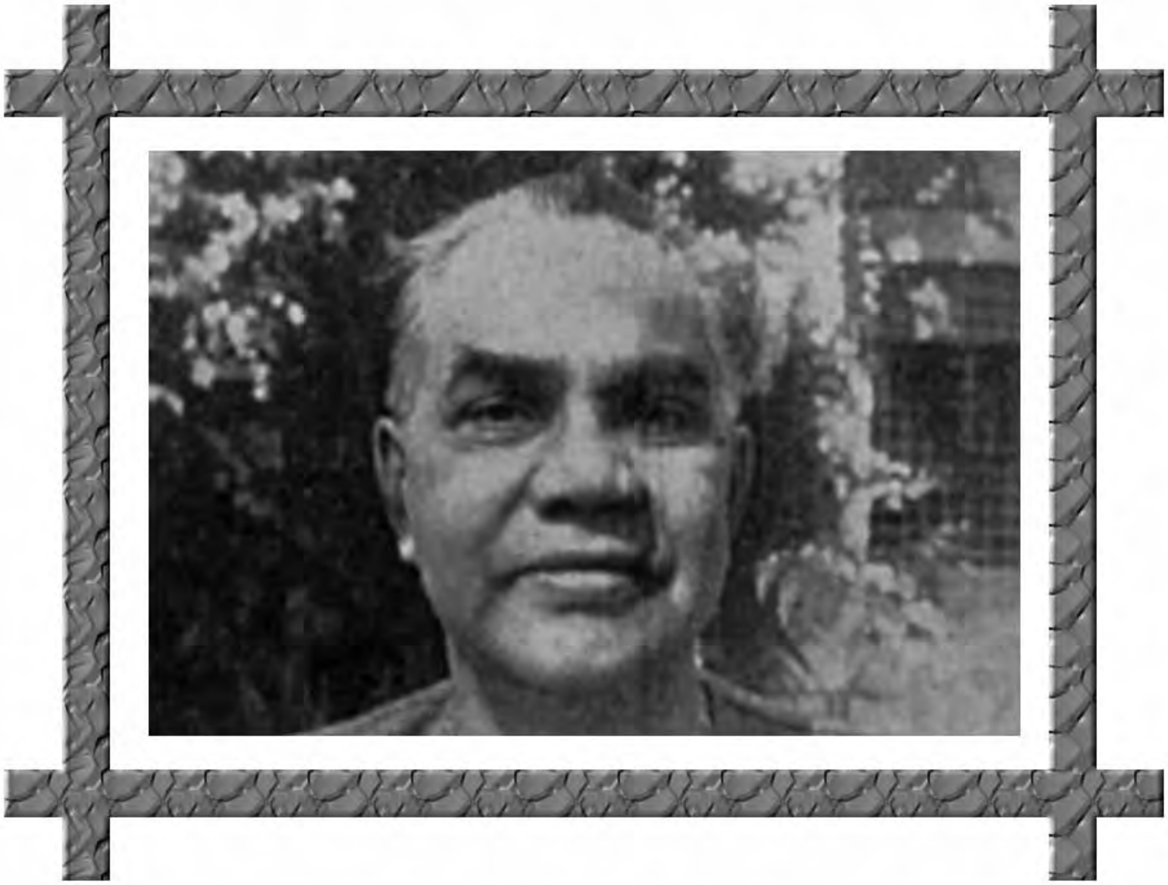
আড্ডাঘরের সবাই একদিন সকালে দেখা করতে এলেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তার পরদিনই তাঁরা চলে যাবেন মজফরপুরে। বিদায় নেবার আগে উপেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, আপনার মুখ দেখে, গলা শুনে আমাদের বড়ই ক্ষিতীশবাবুর কথা মনে পড়ছে। আজ সন্ধ্যায় আপনি যদি একবার আমার বাড়িতে আসেন তাহলে আমাদের মনে হবে ক্ষণিকের জন্য হলেও আমরা ফিরে পেলাম আমাদের প্রিয় বন্ধুকে।

উপেনবাবুর প্রস্তাবে এককথায় রাজি হয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেদিন সন্ধ্যার মুখে তিনি এলেন আড্ডাঘরে। ফরাসের ওপর সবাই গোল হয়ে বসলেন। শুধু ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বেতের ইজিচেয়ারটিই কেবল রইল শূন্য। চা পানের পর উপেন্দ্রনাথ হারমোনিয়ামটা আরও নিজের কাছে টেনে নিয়ে ধরলেন ক্ষিতীশবাবুর সেই প্রিয় গান—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।'

উপেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'গানের অস্থায়ী অন্তরা শেষ করে যখন সঞ্চারীতে এসেছি—তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে/ সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে? হঠাৎ অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, উ-পে-ন বা-বু-উ।

আমি উত্তর দিলাম, হুঁ! অর্থাৎ আমি দেখেছি। দেখেছি ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রক্ষিত বেতের ইজিচেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র, এক লহমার জন্য অবশ্য—কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্যবোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল ক্ষিতীশচন্দ্র। ছায়া নয়, মায়া নয়—ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়। তেমনিই আগেকার মতো পায়ের ওপর পা দিয়ে, ডান হাতের ছড়িটা পায়ের ওপর রেখে আমাদের ওপর দৃষ্টিপাত করে মৃদু মৃদু হাসছেন। ''সশরীরে প্রকাশ'' বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহলে একান্তভাবে তাই।'

ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে আর এক ঘটনা। ক্ষিতীশবাবুকে এইভাবে দর্শন করে মণিবাবু চোখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্যে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন প্রেমসুন্দরবাবু। অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে জল এনে মণিবাবু ও প্রেমসুন্দরবাবুর মুখে ছেটাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য দুজনে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবে এরপর থেকেই 'তাঁদের' নিয়ে মস্করা করার অভ্যাসটি চিরতরে দূর হয়ে গিয়েছিল উপেন্দ্রনাথের।



ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, বিষয় ছিল রসায়ন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে ; তবু আজ অস্বীকার করিতে পারি না, অলৌকিক শ্রেণীর দুইটি ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি। দুইটি ঘটনাই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, আমার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত তদ্দারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।'

সজনীকান্ত দাস। বঙ্গসাহিত্যে তিনি আজীবন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিচরণ করেছিলেন। তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের কষাঘাতে বারেবারে নাজেহাল হয়েছেন বঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নজরুল ইসলামের পাশাপাশি কল্লোলগোষ্ঠীর বিখ্যাত লেখক বিভিন্ন সময়ে 'শনিবারের চিঠি'-র ব্যঙ্গ-লেখনীতে বিদ্ধ হয়েছেন।

কাজি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হল আলোড়ন। আর তারপরেই শনিবারের চিঠির জন্য কলম ধরলেন স্বয়ং সজনীকান্ত দাস। ভবকুমার প্রধান ছদ্মনামে খুব সম্ভবত তিনিই 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডি লিখলেন 'ব্যাঙ' শিরোনামে। তাঁর লেখা প্যারোডি কবিতাটি ছিল এইরকম—

'আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বর্ষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাং।

আমি ব্যাঙ
আমি পথ হতে পথে দিয়ে চলি লাফ;
শ্রাবণ নিশায় পরশে আমার সাহসিকা
অভিসারিকা
ডেকে ওঠে 'বাপ বাপ।'

প্রথমদিকে কাজি নজরুল ইসলাম শনিবারের চিঠির এই ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে উপেক্ষা করার চেষ্টাই করতেন। তবে একসময় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। তিনিও পাল্টা কলম ধরলেন উত্তর দেওয়ার জন্য।

সজনীকান্ত দাসের বয়েস তখন মাত্র বারো। তাঁরা তখন থাকেন মালদহ-ইংরেজবাজারের কাছে কালীতলা পল্লিতে। সেইবছরেই তাঁর পিতা হরেন্দ্রলাল দাস বদলি হয়েছেন পাবনায়। তখন তিনি সাব-ডেপুটি কালেক্টর। মেজ পুত্র আজুর প্রবল অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি ছুটি নিয়ে পাবনা থেকে ফিরে এলেন মালদহে। বাড়ির মেজ ছেলেকে নিয়ে শুরু হল যমে-মানুষে টানাটানি। শহরের বড় বড় চিকিৎসকরাও শত চেষ্টা করেও রোগীকে সুস্থ করতে পারছেন না। বাড়ির সবাই মিলে চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে রোগীর পাশে থেকে সেবা-শুশ্রুষা করছেন। তা সত্ত্বেও দিনকে দিন রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

সেদিন প্রথম রাতে পুত্রের পাশে বসেছিলেন তাঁর মা তুঙ্গলতা দেবী। রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ স্ত্রীকে ঘুমোতে পাঠিয়ে পিতা হরেন্দ্রলাল পুত্রের পাশে এসে বসলেন। ভোর রাতের দিকে তিনি বালক সজনীকান্তকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, বাবা, তুই একটু দাদার পাশে গিয়ে বোস। আমি একটু ছাদ থেকে পায়চারি করে আসি। পিতার আদেশে সজনীকান্ত ঘুমচোখে মেজদার শয্যাপাশে এসে বসলেন।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'তন্দ্রাচ্ছন্ন সজনীকান্ত পাখার বাতাস করছেন তাঁর অসুস্থ মেজদাকে আর ছাদে বাবার ভারী পায়ের শব্দ শুনছেন। অসুস্থ মেজদাও তন্দ্রাচ্ছন্ন।'

আর তারপরে কী ঘটল!

আমরা শুনব স্বয়ং সজনীকান্ত দাসের মুখ থেকে—'হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল, আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুম জড়ানো চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল! সে কি? —সে কি?—বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম।'

হরেন্দ্রলাল তাঁর প্রতিবেশী যতীনবাবুকে কী বলেছিলেন সেই ভোরে। তিনি পুত্রের পাশে বসে কী দেখেছিলেন?

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'হরেন্দ্রলাল একা মুমূর্ষু পুত্রের শিয়রে বসে। রাতের শেষ প্রহর। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক লাল আলো এসে সমস্ত ঘর ভরে গেল। চমকে উঠলেন হরেন্দ্রলাল। বিস্ময়ে হতবাক। একি! কোথাও আগুন লাগল নাকি?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ঘরের চারিদিকে চাইলেন। কারণ অনুসন্ধান করতে চাইলেন। না, কোথাও কিছু নেই। কিন্তু এত তীব্র লাল আলো এলো কোথা থেকে? সেই আলোর মধ্যে তিনি হঠাৎ দেখলেন তাঁর মুমূর্ষু পুত্র বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলছে, এই যে আমি যাচ্ছি।'

হরেন্দ্রলাল আরও বললেন, এই দৃশ্য দেখে আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি আমার অসুস্থ ছেলে আবার বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলুম মৃত্যু আসন্ন। কারণ এই দৃশ্য আমি পূর্বেও দেখেছি আমার দাদার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে। সেদিন আমার দাদা তাঁর মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে বলেছিলেন, এই যে আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজকে! আজুকে কে নিতে এসেছিলেন সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না!

সজনীকান্ত লিখছেন, 'মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সত্যই সব শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দিদি নিতান্ত শিশু অবস্থায় বিদায় লইয়াছিলেন, সে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করে নাই। মেজদার মৃত্যুতে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়নঘর অর্থাৎ বড়ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসিয়া মেজদার প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণশীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চিৎকার করিয়া মাকে ডাকিলেন, ওগো, কে এসেছে দেখে যাও!

মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই 'বাবা আমার' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিটকাইয়া ঝনঝন শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি, মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তাহার পর ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। মা কোথাও স্তব্ধ হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিতাম, বিপদ আসিতেছে।

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকাতেই আমরা হিপনোটাইজড হইয়াছিলাম, ঘটনাটি কখনই সেইভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই।'